প্রথম বর্ষ ॥ দশম সংখ্যা ॥ মাঘ ॥ ১৩৮২

আনন্দমেলা

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ।। দশম সংখ্যা
মাঘ ।। ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া	আজানা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩
গল্প	হীরের আংটি। নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৮
	বিধু দারোগা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২
	জাদুকর বসন্তনিবাস। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
	তিনকড়ি। বুদ্ধদেব গুহ ৩৭
মহাকাব্যের গল্প	ট্রোজান ঘোড়ার গল্প। উমা দাশগুপ্ত ৪৮
চিড়িয়াখানার গল্প	চলো যাই চিড়িয়াখানায়। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫
উপন্যাস	কাপালিকরা এখনও আছে। বিমল কর ২০
	রাজা হওয়ার ঝকমারি। বিমল মিত্র ৩১
কমিক্স	টারজান ৬, ৭, ১০, ১১
	টিনটিন/কাঁকড়া-রহস্য ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫১
প্রকৃতি-পরিচয়	আমাজনের খুদে মানুষখেকো। অভ্র রায় ৩৬
খেলাধুলো	সেরা ওপনার পঙ্কজ রায়। স্ট্রাইকার ৪১
	'রানী রাসমণি'র ছেলেরা ৪৪
	বাপ কা বেটা ৪৫
নতুন বিভাগ	আমাদের কলকাতা। রত্নাকর ১৯
নিয়মিত বিভাগ	জানা না-জানা ১৬
	ম্যাজিকের মতো ১৮
	ম্যাজিক। পি সি সরকার জুনিয়ার ১৮
	অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক ৪০
	বিন্দুবিসর্গ। ইন্দ্রমিত্র ৪৯
	জাদুঘর। শ্রীপান্থ ৫২
	তোমাদের পাতা ৫৩
	আজব চিড়িয়াখানা ৫৪
	ধাঁধার পাতা ৫৫, আচ্ছা বলো তো ৫৫
প্রচ্ছদ	সুরজিৎ ভট্টাচার্য

সম্পাদক ।। অশোককুমার সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা
লিমিটেড এর পক্ষে অক্ষয়কুমার
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট
লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

প্রেমেন্দ্র মিত্র আঞ্জানা

দুধ তো সাদা
কাগজ সাদা
পূর্ণ চাঁদের জ্যোছ্না সাদা
উথাল ঢেউয়ের ফেনা সাদা
আর কী সাদা?
বক সারসের ডানা।
সবার চেয়ে অবাক সাদা
আসমানী আঞ্জানা!
আঞ্জানা তো শুধুই সাদা নয়,
চোখে তোমার যে-রঙ থাকে
সেই রঙের-ই হয়।

আঞ্জানাটা কী?
এমন নাম তো জন্মে শুনিনি!
সুর না কথা,
সুখ না ব্যথা,
গাছ না লতা,
ফুল না উড়ো পাখি?
হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট তারা
নাকি জোনাকি?

কেউ জানে না আঞ্জানা কী!
তবু তার-ই টানে
থেকে থেকে আনমনা হয়
কাজের মধ্যিখানে!
সাত সমুদ্দুর তেরো নদী
সব পেরোবার পরে,
আঞ্জানা-ই কি হাতছানি দেয়
আরেক তেপান্তরে?

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

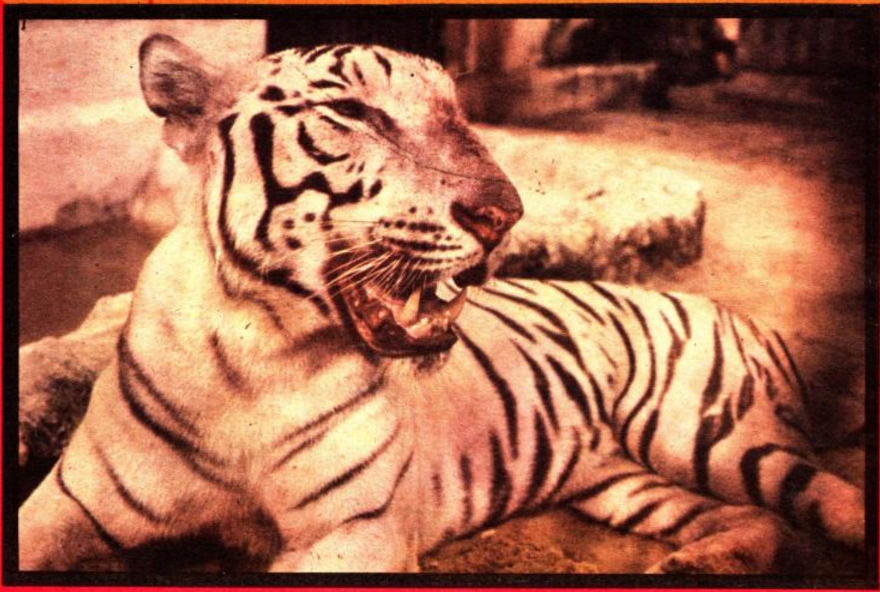

উপরে সাদা বাঘ। নীচে (বাঁয়ে) হাতি, (ডাইনে) চিতাবাঘ

ফটো : তারাপদ ব্যানারজি

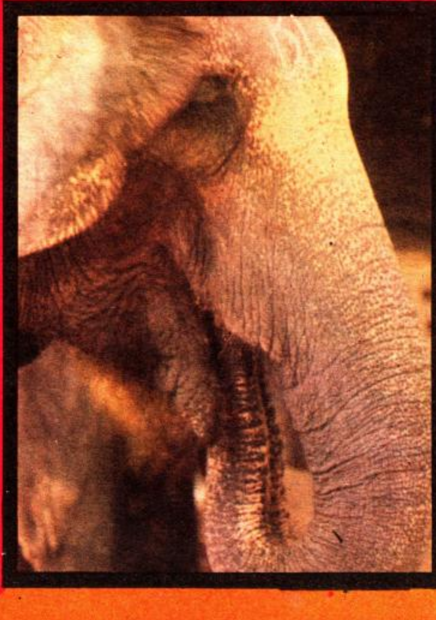

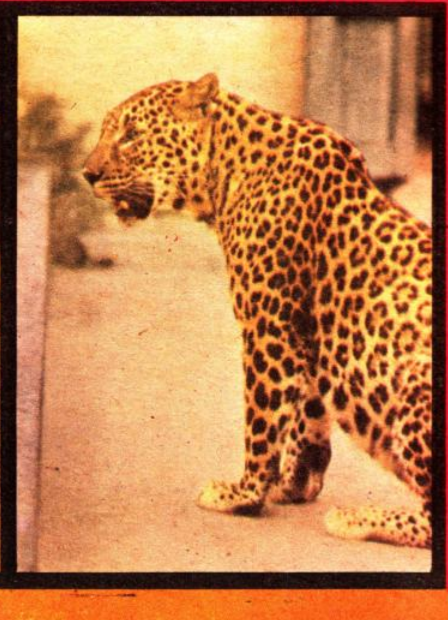

চলো যাই চিড়িয়াখানায়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কলকাতায় বেড়াতে এলে অন্তত একটিবার আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখা চাই। যারা কলকাতাতেই থাকে তারা যে কতবার দেখেছে সেটা তারাই ভালো বলতে পারবে। আর চিড়িয়াখানাতে ঢুকলে সকলেই সব কিছুর আগে বাঘ-ভালুক হাতি-গণ্ডার দেখতে চায়। কিন্তু প্রথম যখন এই চিড়িয়াখানা হয় তখন ওইসব বড়ো বড়ো জন্তুজানোয়ার ছিল না।

সে আজ একশ বছর আগের কথা। অর্থাৎ সেটা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। পশুপাখি ভালোবাসেন এমন কয়েকজনে মিলে আলিপুরে চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁদের মধ্যে যেমন ইউরোপীয়রা ছিলেন তেমনই ভারতীয়রাও ছিলেন। শুধু প্রতিষ্ঠা করলেই তো হয় না, চিড়িয়াখানা চালানোর খরচ চাই আর বাড়ানোর খরচও চাই। খরচের ধাক্কা সামলাতে এগিয়ে এলেন দেশের বড়োলোকরা। যাঁরা তখন অর্থসাহায্য করেছিলেন তাঁদের তালিকাতে প্রথমেই বর্ধমানের মহারাজার নাম। তিনি দিয়েছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। তাতে তৈরি হলো বর্ধমান হাউস—আলিপুর চিড়িয়াখানাতে বাঘ-সিংহের প্রথম আস্তানা।

শোনা যায়, বর্ধমান হাউসে বাঘ-সিংহ রাখার পরেই এক দারুণ কাণ্ড ঘটে। চিড়িয়াখানা থেকে একটা বাঘ নাকি কেমন করে যেন বেরিয়ে পড়ে। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। তখনকার কলকাতা এখনকার মতো এত বড়ো শহর ছিল না বটে, কিন্তু সেই কলকাতাও ছিল বিরাট এক শহর। কলকাতা শহরের মধ্যে ছাড়া-বাঘ—সে কি সহজ ব্যাপার? ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বেরিয়ে পড়ল সৈনিকরা। এদিকে ভয়ে তটস্থ শহরবাসী, ওদিকে বাঘের খোঁজে ব্যস্ত সৈন্যবাহিনী। ভাবো একবার, কাণ্ডখানা কী।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঘটা ধরা পড়েছিল। কোথায় ধরা পড়েছিল তা নিয়ে দুরকম মত আছে। একটা মতে, বাঘটা বেশি দূর পালাতে পারেনি, আলিপুরেরই কোনও ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু কারও কারও মতে বাঘটা নাকি গঙ্গা সাঁতরে চলে গিয়েছিল শিবপুরে, সেখানেই ধরা পড়ে।

বাঘ-সিংহ পোষা বেজায় ঝকমারির কাজ। এক তো তাদের খাবার জোগানোর কাজ। তারপর তাদের ঘরগুলো পরিষ্কার করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। মেজাজ বিগড়োলেই থাবা বসাবে কি কামড়ে দেবে। এছাড়াও আছে অসুখে-বিসুখে তাদের চিকিৎসা করার সমস্যা। বাঘ-সিংহের আবার একরকম অসুখের ভয় খুব বেশি। এই অসুখটার নাম ভারি বিদঘুটে। ট্রিপেনোজোমিয়োসিস। বাংলায় বলতে পারি কালঘুমের অসুখ। এই অসুখে বাঘ বা সিংহ প্রথমে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়, তারপর ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ে, ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুমোতে ঘুমোতে মরে যায়। অসুখটা আবার ভীষণ ছোঁয়াচে। একবার শুরু হলে আর রক্ষে নেই—একে একে সবগুলোই এই কালঘুমের অসুখে মরে যেতে পারে।

তাই কোনও বাঘ বা সিংহের কালঘুমের অসুখ হলেই প্রথমে সেটাকে সরিয়ে ফেলতে হয়, নিয়ে যাওয়া হয় চিড়িয়াখানার হাসপাতালে। এখানে পশুটিকে রাখা হয় এমন একটা খাঁচাতে যে-খাঁচাটাকে ইচ্ছেমতো চেপে চ্যাপ্টা করা যায়। খাঁচাটাকে চ্যাপ্টা করে ভিতরের পশুটিকে দুপাশের গরাদের গায়ে আষ্টাসে চেপে ধরলে বাছাধন আর একটুও নড়াচড়া করতে পারে না। তখন তার গায়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। যতদিন-না সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে, ততদিন ধরে এইভাবে চিকিৎসা চলে।

এর সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানার বাকি বাঘ-সিংহকে দেওয়া হয় কালঘুমের প্রতিষেধক টিকা। সে বেজায় কঠিন কাজ। বিপদের ভয়ও তাতে প্রচুর। খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় লম্বা লগি আর লগির মাথায় থাকে শক্ত মোটা দড়ির ফাঁস। ফাঁসটা গলিয়ে দেওয়া হয় পশুটির গলায়। তারপর হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে টেনে আনা হয় গরাদের ফাঁকে, এমনভাবে গরাদের গায়ে টেনে ধরা হয় যে খাঁচার বাইরে থেকে তাকে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়।

ব্যাপারটা যে পশু মহাশয়ের একেবারেই মনঃপূত নয় সেটা বোঝা যায় তার ভয়ঙ্কর তর্জন-গর্জনে। ওদের তো ওইরকমই বুদ্ধি—বুঝতে পারে না যে, ওদের ভালোর জন্যেই এসব করা হচ্ছে।

সবাই জানে বাঘ-সিংহ রাত্রিচর মাংসাশী প্রাণী। কিন্তু আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা চিতাবাঘ আছে যে বেশ কিছুদিন দইভাত খেয়ে কাটিয়েছে। সাদা বাঘের এলাকা থেকে বেরিয়ে ডানদিকের একটা খাঁচায় এই চিতা-বাঘটাকে তোমরা দেখতে পাবে। তার নাম রানী।

উত্তর বাংলার এক চা-বাগানে বাচ্চা অবস্থায় রানী ধরা পড়ে। চা-বাগানের মালিক আমিষের নাম শুনলেই রাম নাম করেন। রানীকে তাই তিনি দইভাত খাওয়াতেন। চিতাবাঘের ছানা আর কী করে! পেটের জ্বালায় যা পেত তা-ই খেত। চিড়িয়াখানাতে আসার পর রানী আবার মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়। দই-ভাত খাওয়ার গুণেই কিনা জানিনে—রানী বড়ো আদুরে মেয়ে—চেনালোকের হাতে আদর খেতে খুব ভালোবাসে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার একটা খুব দেখবার জিনিস হলো সাদা বাঘ। মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জঙ্গল থেকে সাদা বাঘ আনা হয়। পৃথিবীর আর কোথাও সাদা বাঘ দেখা যায় না। এদের গায়ের রং সাদা আর চোখে নীলচে আভা। কী করে যে রেওয়ার জঙ্গলে এরকম সাদা বাঘ হলো সে রহস্য আজও ভেদ করা যায়নি। সম্ভবত বহুকাল ধরেই এরা সেখানে বসবাস করছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার তরফ থেকে ডাক্তার সামন্ত যখন রেওয়া থেকে সাদা বাঘ আনতে গিয়েছিলেন, তখন গোবিন্দগড়ের রাজবাড়িতে তিনি আরও অনেক সাদা বাঘের চামড়া দেখেছিলেন।

অন্য সব জীবজন্তুর কথা সামনের বারে বলব।

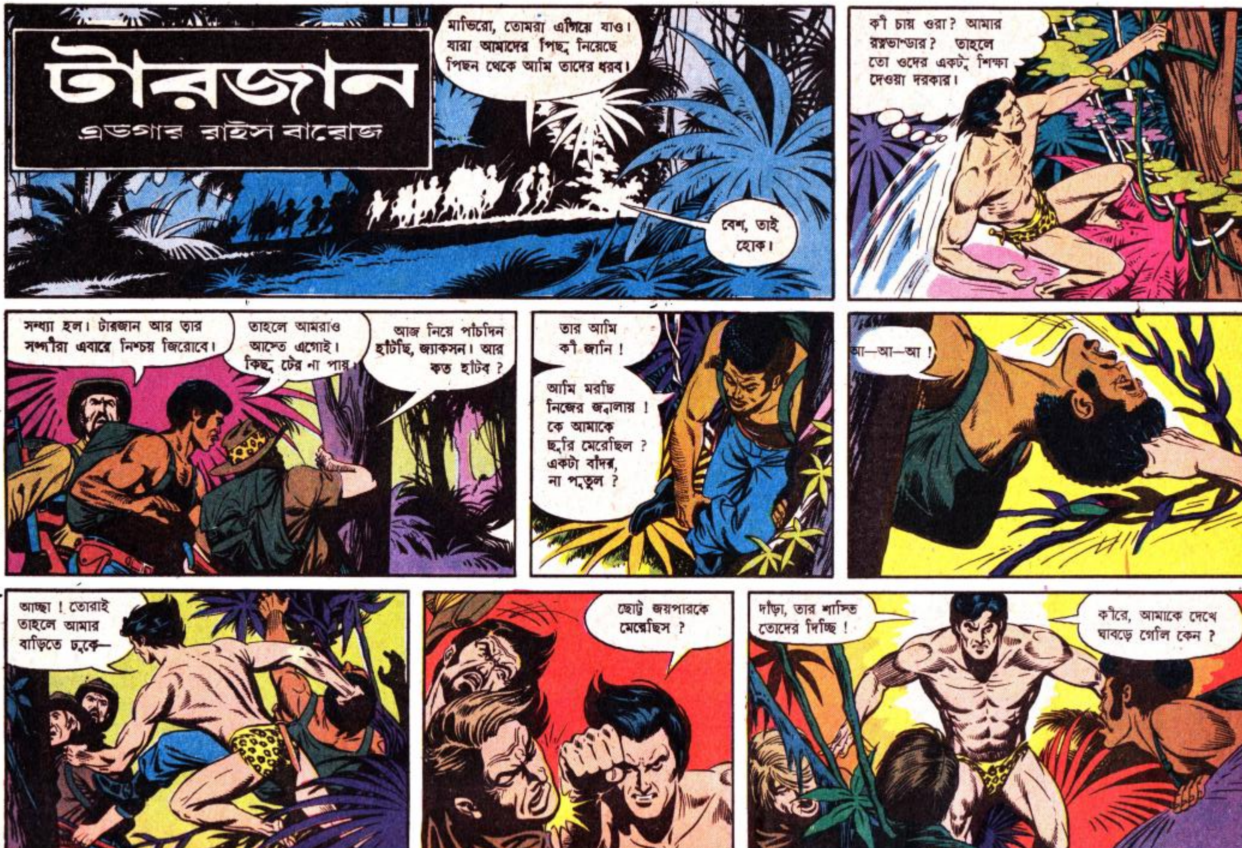
টারজান
এডগার রাইস বারোজ
মাভিরো, তোমরা এগিয়ে যাও। যারা আমাদের পিছু নিয়েছে পিছন থেকে আমি তাদের ধরব।
বেশ, তাই হোক।
কী চায় ওরা? আমার রত্নভাণ্ডার? তাহলে তো ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।
সন্ধ্যা হল। টারজান আর তার সঙ্গীরা এবারে নিশ্চয় জিরোবে।
তাহলে আমরাও আস্তে এগোই। কিছু টের না পায়।
আজ নিয়ে পাঁচদিন হাঁটছি, জ্যাকসন। আর কত হাঁটব?
তার আমি কী জানি!
আমি মরছি নিজের জ্বালায়! কে আমাকে ছুরি মেরেছিল? একটা বাঁদর, না পুতুল?
আ—আ—আ!
আচ্ছা! তোরাই তাহলে আমার বাড়িতে ঢুকে—
ছোট্ট জয়পারকে মেরেছিস?
দাঁড়া, তার শাস্তি তোদের দিচ্ছি!
কীরে, আমাকে দেখে ঘাবড়ে গেলি কেন?

জয়পার খুদে-মানুষ, তাকে তোরা মেরেছিস !
এবারে পারিস তো আমাকে মার!
কাপুরুষের বেহদ্দ!
আয়, লড় আমার সঙ্গে!
জ্যাকসন, গুলি চালাও!
কিন্তু পারবে কী করে? ক্রুদ্ধ টারজানের সামনে ওরা অসহায়!
টারজানকে ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওরা...
গুলি চালালে মেরে ফেলব!
আর না, আর না, দয়া করো!
আর-কখনও টারজানের কোনও বন্ধুকে মেরো না! আর-কখনও লোভের ফাঁদে পা দিও না!
এবারে যাও...প্রাণ নিয়ে পালাও!

এর পর দশের পাতায়

হীরের আংটি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সকালবেলা সবে দ্বিতীয় কাপ চা নিয়ে বিরূপাক্ষ একটি চার্মিনার ধরিয়েছে, সিঁড়িতে হালকা পায়ের জুতোর শব্দ কানে এল।

বিরূপাক্ষ বুঝতে পারে, আগন্তুক আর কেউ নয়, মিতুলবাবু। বিরূপাক্ষ চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে যায়, দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত পরে মিতুলবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কী সংবাদ মিতুলবাবু, আজ তো বুধবার, তোমার স্কুল নেই?"

মিতুল সামনের সোফাটায় বসতে বসতে বললে, "স্কুলে আজ আর যাওয়া হল না, বিরূকাকু।"

"কেন?"

"একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।"

"বিশ্রী ব্যাপার!"

"হ্যাঁ, আমার ছোটকাকুর হীরের আংটিটা সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হীরের আংটি! তা আংটিটা ছিল কোথায়?"

"ছোটকাকুর ডান হাতের আঙুলে। আংটিটা ঢিলে নয় যে আঙুল থেকে পড়ে যাবে কোথাও। বেশ টাইট ছিল আংটিটা।"

"হয়ত মনের ভুলে কোথাও খুলে রেখে দিয়েছেন।"

"না।"

"তবে তোমার কী মনে হয়?"

"কেউ সরিয়েছে আংটিটা। বাড়িতে একটা নতুন চাকর এসেছে, মনে হচ্ছে এ তারই কাজ। আমি হলফ করে বলতে পারি, এ ঠিক কেষ্টার কাজ।"

"কতদিন আছে চাকরটা তোমাদের বাড়িতে?"

"মাস ছয়েক—"

"এর আগে কখনো কিছু হারিয়েছে ও আসার পর?"

"না। তাছাড়া ও কিছু কুড়িয়ে পেলে তখনই দিয়ে দেয়; একবার একটা একশো টাকার নোট ও ঝাড় দেবার সময় কুড়িয়ে পেয়ে মাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, আর একবার দিদিভাইয়ের কানের সোনার দুল বাথরুমে কুড়িয়ে পেয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাই বাড়ির সকলের ধারণা, ও আংটিটা চুরি করেনি। কেষ্টাও কাঁদছে, বলছে, সে চুরি করেনি—"

"বাড়ি ঘর দোর নিশ্চয়ই সব ভাল করে খোঁজা হয়েছে?"

"অন্তত বার চারেক। ছোটকাকু আমাকে কী বলেছে জানো?"

"কী?"

"আমি যদি আংটিটা খুঁজে বের করে দিতে পারি তো সে মেনে নেবে আমি গোয়েন্দাগিরি কিছু-কিছু করতে পারি।"

"তাই তো, তাহলে তো দেখছি আংটির একটা ফায়সলা তোমাকে করতেই হয় মিতুলবাবু, তা তোমার ধারণা এটা ঐ কেষ্টারই কাজ, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বল তো?"

"তুমি শুনলে হাসবে না তো?"

"না, না, বলো কী বলতে চাও?"

"ছোটকাকু ভীষণ ভিতু। ভূতের ভয় তার খুব। তাই সে একা শুতে পারে না তিনতলার ঘরে, মা তাই কেষ্টাকে ছোটকাকুর ঘরে শুতে বলেছিল। কেষ্টা এখানে আসা অবধি তাই শোয়। তাছাড়া ছোটকাকুর সব কাজ ঐ কেষ্টাই করে, কেষ্টা না-হলে তার একদণ্ড চলে না। কেষ্টা ছোটকাকুর কাছে-কাছে থাকে, রাত্রে ঐ ঘরেই শোয়, হয়ত কাল রাত্রে কোন সময় কায়দা করে ছোটকাকুর আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে সরিয়ে ফেলেছে।"

"কিন্তু আংটিটা তোমার কাকুর আঙুলে বলছ বেশ টাইট হয়ে বসে ছিল—"

"হ্যাঁ।"

"তবে, খোলার সময় জানতে পারল না, তবে..."

"কী তবে?"

"তোমার কাকুর বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড়গুলো ভাল করে দেখো তো কোন-কিছুর দাগ-টাগ আছে কি না।"

"কিসের দাগ?"

"দেখোই না কোন-কিছুর দাগ আছে কিনা। আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে..."

"কেষ্টার বিছানাপত্র আর সুটকেশ তো? তাও দেখা হয়েছে। তাকে সার্চ করাও হয়েছে।"

"ভাল কথা, তোমার কাকুর হাতে কাল রাত্রে আংটিটা ছিল কিনা কেউ দেখেছে?"

"মা দেখেছে, রাত্রে টেবিলে বসে খাবার সময়ও আঙুলে ছিল আংটিটা। দিদিভাইও দেখেছে, ছিল।"

"হুঁ। আচ্ছা তোমার কাকুর ঘরে জিনিসপত্র কী আছে?"

"কাকুর পড়ার টেবিল, একটা চেয়ার, বই-খাতাপত্র, আর একটা ছোট আলমারি, জামা-কাপড় রাখবার জন্য।"

"আর-কিছু নেই? কোন মূর্তি, বা ফুলদানি"

"মূর্তি নেই, তবে ফুলদানি আছে। কাকুর খুব ফুলের শখ, রোজ রাত্রে বাজার থেকে টাটকা ফুল নিয়ে আসে, সারারাত্রি আর পরের দিন রাত্রি পর্যন্ত সেই ফুল থাকে। কাকুই ফুলদানির ফুল বদলায়।"

"তাহলে কালকের ফুল আজ এখনো আছে?"

"আছে।"

"একটা কথা জানো? কেষ্ট আজ সকালে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল কি?"

"না। ভোরবেলা উঠে কাকু তার আঙুলে আংটি না দেখে চেঁচামেচি শুরু করে। কেষ্টা তখনও ঐ ঘরে মেঝেতে ঘুমিয়ে, নাক ডাকছিল।"

"তাহলে বাড়ির বাইরে যায়নি?"

"না।"

"শোন মিতুলবাবু, আংটিটা তাহলে এখনও বাড়ির মধ্যেই আছে, কোথাও পাচার হয়নি।"

"কিন্তু—"

"যাও ভাল করে ঐ ঘরেই গিয়ে খুঁজে দ্যাখো। না-পেলে আমাকে জানিও, আর কেষ্টাকে বেরুতে দিও না।"

মিতুলবাবু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এল, মুখে হাসি।

"কী খবর মিতুলবাবু?" বিরূপাক্ষ শুধায়, "সংবাদ শুভ নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ আংটি পাওয়া গিয়েছে। তবে আমার ধারণাই ঠিক, এ কেষ্টারই কাজ।"

"কেষ্টা স্বীকার করেছে কিছু?"

"না, সে আগের মতই কাঁদছে আর বলছে, সে কিছু জানে না।"

বিরূপাক্ষ মৃদু হেসে বললে, "তা কী করে কোথায় পেলে বলো এবার শুনি।"

"প্রথমেই গিয়ে আমি কাকুর বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় পরীক্ষা করি। আগের দিনই চাদরটা মা বদলে দিয়েছিল। চাদরে তেলের দাগ দেখলাম সামান্য—"

"তারপর?"

"গন্ধ শুঁকে দেখলাম কড-লিভার তেলের গন্ধ।"

"কড-লিভার তেল?"

"হ্যাঁ, কাকু তো রোজ খায় সকালে উঠে, তার ধারণা ওতে শরীর সুস্থ থাকে। ছুটে গেলাম কাকুর কাছে, শুধালাম, কাকু আজ কড-লিভার অয়েল খেয়েছ? কাকু তো চটেই লাল। বলে, ইয়ার্কি দিচ্ছ—ইডিয়েট কোথাকার! কিন্তু কাকুর গা থেকে তখনও কড-লিভার অয়েলের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমি বুঝলাম কী ঘটেছে।"

"কী ঘটেছে?"

"ঐ কড-লিভার অয়েলই কাকুর আঙুলে লাগিয়ে কুম্ভকর্ণ কাকুর আঙুল থেকে রাত্রে কোন একসময় আংটিটা খুলে নিয়েছে। তাহলে কোথায় রাখল সে আংটিটা? কোথায় রাখতে পারে ভাবতে-ভাবতে চোখ পড়ল ফুলদানিটার দিকে।"

"সাবাস, তারপর?",

"শেষ পর্যন্ত ফুলদানির মধ্যেই আংটিটা পাওয়া গেল। ভাগ্যিস তুমি কাকুর ঘরে জিনিসপত্র কী কী আছে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে। কিন্তু তোমার কাছে আসার আগে কথাগুলো আমার মনে কেন হল না? হওয়া উচিত ছিল, তাই না?"

বিরূপাক্ষ মৃদু হাসছে।

"তুমি হাসছ বিরুকাকু?"

পাশেই শিশির বসে ছিল, সে বললে, "দুঃখ করো না মিতুলবাবু, তুমি এই বয়সেই যা বুদ্ধির পরিচয় দাও, বড় হলে তুমি বিরূপাক্ষ সেনকেও কুপোকাত করবেই—কিরীটী রায় বেঁচে থাকলে তাকেও টপকে যাবে তখন।"

"তা কেষ্টার কী ব্যবস্থা করলে মিতুল বাবু?" বিরূপাক্ষ জিজ্ঞেস করল।

"হাতে-নাতে তো ধরতে পারিনি, শুধু অনুমান—"

"তা ঠিক। তা ছাড়া বেচারা কেষ্টার বয়সই বা কী, চোদ্দ-পনের মাত্র, কিছুটা লোভে পড়েই অপকর্মটা করে ফেলেছিল।"

"মা কিন্তু বলেছে ওকে আর চাকরিতে রাখবে না। জানেন, আমার হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করছিল, একটু আগে।"

"তোমার ছোটকাকু কী বলে?"

"ছোটকাকু বলেছে, ওর নাকি দশ বছর জেল হওয়া উচিত।"

সবাই হাসে।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

এক্ষুনি এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাও! যাচ্ছ কিনা, আমার যোদ্ধারা তা দেখবে!
যাও! এক্ষুনি!
মাভিরোর দলবলের সঙ্গে এসে ফের যোগ দিল টারজান। এগিয়ে চলল ওপোর-শহরের দিকে।
টারজানরা রওনা হবার দুদিন বাদে খুদে-জয়পার জ্ঞান ফিরে পায়...
জয়পার, তুমি ঠিক জানো?
ওই তিনটে চোর সত্যি টারজানের পিছু নিয়েছে? কী বললে? রত্নগুহার সন্ধানে?
হ্যাঁ জেন, আমি তাদের আটকাতে চেয়েছিলুম!
আইবোল, আমি টারজানকে সাবধান করে দিতে চললুম!
একা যেও না। মুগাম্বি আর গিয়ারেকে সঙ্গে নাও। খাবারের থলে তৈরী করে দিচ্ছি।
সাবধানে যাবে!
ধন্যবাদ আইবোল!
খুদে-জয়পারকে দেখো। ও এখনও ভারী দুর্বল।
গেল কোথায়!
লেডি জেন!
যাচ্ছলে! খুদে-জয়পার কোথায় গেল!

এর পর আগামী সংখ্যায়

বিধু দারোগা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার বিধু দারোগা আমাদের গঞ্জে বদলি হয়ে এলে হৈ-হৈ পড়ে গেল।

ব্রিটিশ আমলে দারোগা-পুলিশকে ভারী ভয় খেত গাঁ-গঞ্জের লোকেরা। রাস্তায় ঘাটে বা হাটে-বাজারে পুলিশ দেখলেই নিরীহ সজ্জন মানুষরাও সাঁত সাঁত করে এধারে ওধারে লুকিয়ে পড়ত। এক স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগোছের লোক বটতলায় বক্তৃতা দিতে এলেন। শ পাঁচেক লোক জড়ো হয়ে গরম বক্তৃতা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ে একটা টিংটিঙে রোগা লাল-পাগড়িওলা পুলিশ হাট থেকে পালং শাক কিনে ফিরছিল। তাকে দেখে সেই পাঁচশ জোয়ান মদ্দ লোক দে-দৌড় দে-দৌড়। স্বদেশী নেতা গাছতলায় বসে বিড়ি ধরিয়ে আপনমনে হতাশভাবে বললেন, হোপলেস্। আর একবার, গঞ্জের নদীর ঘাট থেকে লোক-ভর্তি একটা নৌকো ছাড়ছে বিকেলবেলায়, সেই সময়ে গঞ্জের দারোগা আর কয়েকজন পুলিশও ওপারে যাবে বলে এসে নৌকোয় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিনা কারণে বিস্তর লোক ঝুপ ঝুপ করে হাঁটুজলে নেমে পালাতে লাগল। এমন কী, তাদের মধ্যে গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইও ছিলেন। পরে তাঁকে সবাই যখন জিজ্ঞেস করল, তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "কী জানি বাবা, সবাই পালাল দেখে আমিও জলে নেমে পালালাম। ভয় বড় সংক্রামক।"

তো এই ছিল দারোগা-পুলিশদের সে-আমলের দাপট। বিধু দারোগা ছিলেন সেই দাপুটেদের মধ্যেও আর-এক কাঠি দাপুটে। তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় এ কেবল কথার কথা নয়। তিনি গঞ্জে এসেই ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন যে, সামনের হাটবারে সবাই যেন স্বচক্ষে দেখে যায়, থানার উত্তর ধারের দিঘিতে বাঘে আর গরুতে এক ঘাটে জল খাবে।

সেই হাটবারে দিঘির ধারে লোক ভেঙে পড়ল। বাঁধানো ঘাটে বিশাল চেহারার বিধু দারোগা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে কেউ হাসতে দেখেনি কখনো। ভীষণ রাগী চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ যার ওপর পড়ছে সে-ই নিজের জায়গা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের ব্যায়ামবীর ছোটোকাকাও তিনবার জায়গা বদল করে অবশেষে কচুবনের ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ জোরে কথা বলছে না, ফিসফাস গুজগুজ করছে। সবাই শুনে আসছে বটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার কথা, কিন্তু কেউ কখনো দেখেনি। হারু মণ্ডলের বাঁকানো শিঙওলা দুষ্টু গরুটা খুঁটোয় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঘ তখনো দেখা যাচ্ছে না। তাই নিয়ে সকলের কৌতূহল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাশের গাঁয়ে প্রবর্তক সার্কাস গত অমাবস্যা থেকে খেলা দেখাচ্ছে। সেদিক থেকে একটা খাঁচাওলা গাড়ি বলদে টেনে আনল। খাঁচার মধ্যে গলায়-দড়ি-বাঁধা বাঘ বসে ঝিমোচ্ছে। অনেকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বাঘকে আফিং খাইয়ে রাখে কিনা, তাই ঐ ঝিমুনি।

তা সে যাই হোক, গায়ে গেঞ্জি আর কালো ফুল-প্যাণ্ট পরা রোগা রিং মাস্টার লোকটা হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খাঁচার দরজায়, দুজন লোক খাঁচার দরজাটা ওপর থেকে টেনে তুলল। খাঁচার দরজা খোলা হতেই লোকজন সব দুড়দাড় দৌড়ে খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাটে রইলেন শুধু রিং মাস্টার, হারু মণ্ডল, বিধু দারোগা আর সার্কাসের দুজন লোক। থানার সিপাইরাও সব তফাতে এসে দাঁড়াল। বাঘ বেরোবে, ইয়ার্কির কথা নয়।

তা বাঘটা আফিংখোরই হবে। রিং মাস্টার বিস্তর চাবুকের শব্দ করল, খোঁচাল, তবু বেরোয় না। বার তিনেক হাই তুলল অবিকল বুড়ো মানুষের মতো শব্দ করে। দারোগা মশাই ধমক দিয়ে বললেন, "টেনে বের করো কুলাঙ্গারটাকে।" রিং মাস্টার সেলাম দিয়ে বলল, "আপনাকে সামনে দেখে একটু ভয় খেয়েছে।"

অবশেষে দড়ি ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করে তাকে বের করা হল। কী আলিস্যি তার! বাইরে বেরিয়েও অবিকল বেড়ালের মতো ডন মারল একটা, তারপর ঘুমচোখে চারদিকে চাইতে লাগল। মনে হল, বাঘটা চোখে ভাল দেখতে পায় না, ভুরু কোঁচকানো, খুব ঠাহর করে করে দেখছে।

বিধু দারোগা হাঁক ছাড়লেন, "দুটোকে জলের কাছে নিয়ে যা।"

তখন হারু মণ্ডল তার দুষ্টু গরুটাকে আর রিং মাস্টার তার অলস বাঘটাকে দড়ি ধরে টানতে লাগল। অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর দুটোকে জলের কাছে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল বটে, কিন্তু কেউই জলে মুখ দেয় না। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার কথা। জলই যদি না খায় তো দারোগাবাবুর সম্মান থাকে কী করে! তাই তখন হারু মণ্ডল তার গরুর গলকম্বলে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলতে লাগল, "খাও মা ভগবতী, জল খাও। এই একবারটি খাও মা, আর কখনো বলব না। ঐ ছাগলের মতো বাঘটাকে দেখে ডরিয়ো না মা, ওর দাঁত নড়ে, চোখে ছানি, বড্ড ভিতু জীব।"

ওদিকে রিং মাস্টারও সপাসপ চাবুকের শব্দ করে বাঘটার ল্যাজ মলে দিয়ে বলে, "ড্রিঙ্ক্ ওয়াটার বেঙ্গল-টাইগার, ড্রিঙ্ক, কাম কাম, হ্যাভ কারেজ, দি কাউ উইল ফ্লাই অ্যাণ্ড শো হার লেজ। ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক—"

দারোগাবাবু উঠে ফের হাঁক দিলেন, "দুটোর দড়ি খুলে দে। আপুসে জল খাবে।"

তো তাই হল। হারু মণ্ডল তার গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "কাল থেকে তোকে জল দিইনি মা, দারোগাবাবুর মুখ চেয়ে এতক্ষণ তেষ্টায় কাঠ করে রেখেছি, এবার চোঁ করে পেট ভাসিয়ে খা মা।"

রিং মাস্টারও তার বাঘকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "ইউ

হ্যাভ নো ওয়াটার ফর টু ডেজ বেঙ্গল, নাউ ড্রিঙ্ক।"

দৃশ্যটা দেখার মতোই। এই আমরা প্রথম দেখলাম জীবনে। একটা গরু আর একটা বাঘ পাশাপাশি ভাই-বোনের মতো দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। সবাই রৈ-রৈ করে উঠে দারোগাবাবুর জয়ধ্বনি দিতে থাকল। কবিয়াল দুকড়ি হালদার গান বেঁধে গাইতে লাগল, "ধন্য হে দারোগা বিধু, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥ একই ঘাটে জল খায় গাই আর ব্যাঘ্র বন্য হে—"

কিন্তু জয়ধ্বনির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি, দুকড়ি কবিয়াল 'হে'র টান দিয়ে তখনো দম ধরে রেখেছে, এমন সময়ে বাঘটা জল থেকে মুখ তুলে গরুটার দিকে তাকাল। গরুটাও তাকাল বাঘটার দিকে। ফোঁস ফোঁস করে দুজনেরই নিশ্বাস পড়ল। বাঘটা গরু চেনে, সে গন্ধ পেয়ে পাশে দাঁড়ানো গরুটাকে শুঁকছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না বলে বোধ হয় ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু হারু মণ্ডলের গরু কখনো বাঘ দেখেনি, তাই সে একটুও ঘাবড়াল না। বরং সে বেশ রাগের চোখে বাঘটাকে দেখতে লাগল। সেটা হাড়-হারামজাদা গরু, বহুবার খোঁটা উপড়েছে, খোঁয়াড়ে গেছে, তার গুঁতো খায়নি এমন মানুষ গাঁয়ে বিরল। বাঘটার ভাবসাব দেখে সে বোধ হয় বেশ বিরক্ত হয়েছিল, তাই বাঘের মুখের ওপরেই সে ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে একটু এগোলো।

দারোগাবাবু মহানন্দে গোঁফ চুমড়ে দৃশ্যটা দেখছেন তখন। হাসেন না বটে, কিন্তু হাসি তাঁর চোখের দৃষ্টি, গালের মাংস, আর ভাবভঙ্গীর মধ্যে ফুটে উঠছিল। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে।

গরুর ফোঁস শুনে বাঘটা দু'পা পিছিয়ে এল। বহুকাল অভ্যাস নেই বলেই বোধ হয় হাঙ্গামায় যেতে চাইল না। কিন্তু গরুটাও বদমেজাজী। তার তখন রোখ চেপেছে। সে একটু শিং নাড়া দিয়ে দু পা এগোলো। বাঘটা আবার পিছিয়ে আসে। গরুটা একটা 'হাম্বা' দিয়ে হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে মাথাটা নিচু করে হুড়হুড় করে এসে হুম্ করে একটা ঢুঁ দিল বাঘটাকে। বাঘটা মারপিট ভুলেই গেছে। আচমকা ঢুঁটা খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে আলিস্যি ঝেড়ে দুই লাফে উঠে এল ঘাটের চাতালে। পিছনে গরুটা।

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে পৈঠায় উঠে গেলেন সাঁত করে। লোকে থ। এমনটা হবে কেউ ভাবেনি। এ কী দৃশ্য রে বাবা! প্রকৃতির সব নিয়ম-কানুন যে ভণ্ডুল হয়ে গেল! বাঘটা তখন দিঘির ধারের মাঠটায় প্রাণভয়ে ছুটছে। হারুর গরু মহাতেজে শিং নেড়ে দৌড়োচ্ছে তার পিছু-

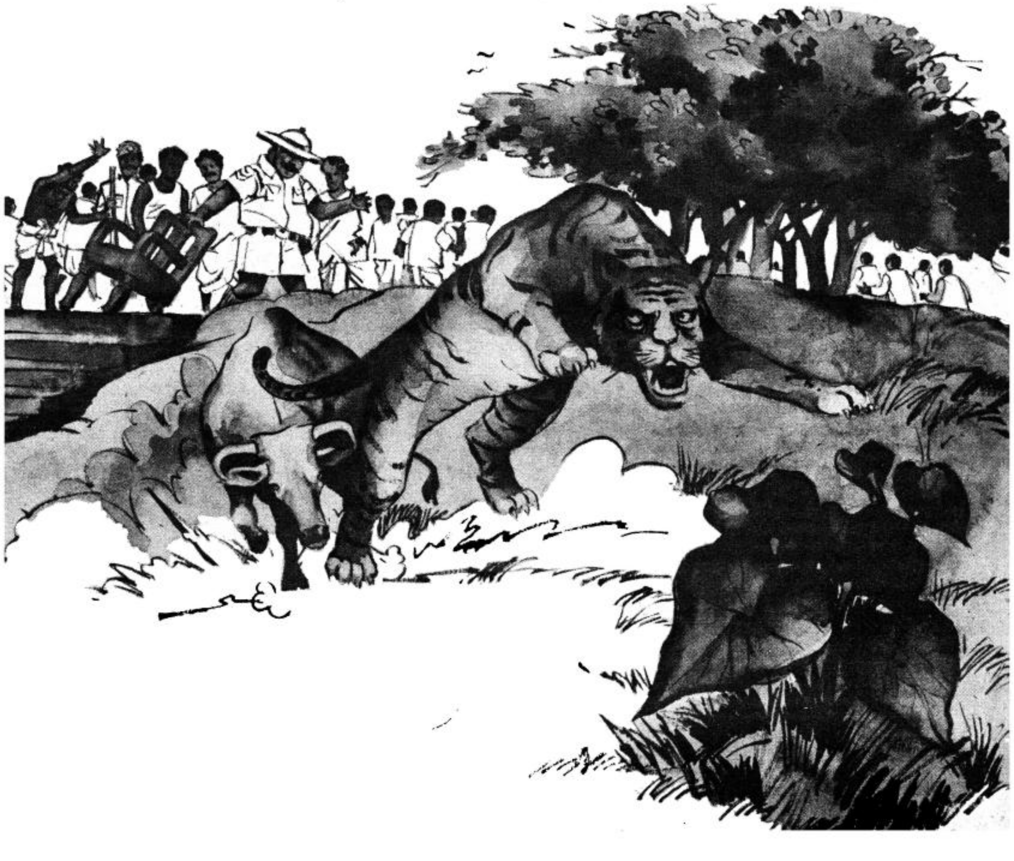

পিছু, গুঁতোবেই। বাঘটা হালুম-মলুম বলে ডাক ছাড়ছে প্রাণপণে। গরুটা হাম্বা-খাম্বা বলে তম্বি করছে তাকে। সে কী দৌড়! যেমন বাঘ ছোটে, তেমনি গরু। ছুটতে ছুটতে বাঘের দমসম অবস্থা। ভারী কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। হারু মণ্ডল বিস্তর ডাকাডাকি আর সাধাসাধি করে তার গরুকে ফেরাতে চাইছে। গরু ফিরছে না। রিং মাস্টার ডুকরে উঠে বলছে, "ও ভাই হারু, আমার গরিব বাঘটাকে তোমার গুন্ডা গরু মেরে ফেললে!"

তা ফেলতই মেরে। বাঘটা ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছে তখন, গরুটা মহাতেজে প্রায় ধরো-ধরো করে ফেলছে তাকে, এমন সময়ে হারু মণ্ডল গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল তার ভগবতীর সামনে, বলল, "মা গো, অনেক লীলা দেখিয়েছো মা। অনেক বাঘ-সিংহী ধরে দেবো মা তোমায়, সব কটাকে গুঁতিয়ে ঢিট্ কোরো। আজ যে তোমার জাব্‌নার সময় হয়ে গেছে মা।"

এইসব শুনে ভগবতী দাঁড়িয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। বাঘটাও ফাঁক বুঝে এক লাফে খাঁচায় ঢুকে ঝাঁপের দরজাটা ফেলবার জন্য নিজেই পিছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে টানাটানি করতে লাগল। খাঁচার ওপরের লোক দুজন ঘাপটি মেরে ছিল, তাক বুঝে ঝপ্ করে দরজা ফেলে দিল। বাঘটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে হ্যা হ্যা করে হাঁফাতে লাগল।

এই ঘটনার পর বিধু দারোগার নাম-যশ সহস্রগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গঞ্জে। তাঁর রাজত্বে শুধু বাঘে-গরুতে একঘাটে জলই খায় না, সেখানে গরুর তাড়ায় বাঘেরও জান লবেজান হওয়ার জোগাড়। সুতরাং সাবধান!

সবাই তাই সাবধান হয়ে গেল। চুরি ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ, ডাকাতি বাড়ন্ত, ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রবীণ লোকেরা থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে জুতো ছেড়ে রেখে থানার উদ্দেশে হাতজোড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায়। যেমন সবাই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে করে। বিধু দারোগা ব্যাপার দেখেন আর হাসেন। না, হাসেন না ঠিক, কিন্তু হাসি তাঁর গোঁফের ডগায় ঝুলে থাকে, নাকের ডগায় কাঁপে, ভুরুতে নাচে। সবাই বুঝতে পারে, বিধু দারোগা হাসছেন। অথচ হাসছেন না। ময়রারা দারোগা-সন্দেশ, বিধু-অমৃতি বের করে ফেলল। খুব বিক্রি।

ওদিকে ভগবতীরও খুব নাম-ডাক। গঞ্জের লোক তো আছেই, আশপাশের গাঁ গঞ্জ, বহু দূরের ভিন গাঁ, এমন কী শহর থেকে পর্যন্ত লোক ঝেঁটিয়ে আসছে রোজ। ভিড়েক্কে ভিড়। সকলেই ভগবতীর জন্য রাশি রাশি খাবার আনছে। শাকপাতা, লাউটা-কুমড়োটা তো আছেই, সেই সঙ্গে সন্দেশ-রসগোল্লা, দুধ-দৈ, এমন কী ঘি-মাখন পর্যন্ত। হারু মণ্ডলের গোয়ালঘরে পাহাড়-প্রমাণ খাবার জমে গেল। অলৌকিক গরুর মহিমা শুনে জমিদার মশাই বিলিতি নেট দিয়ে ভগবতীর জন্য ভাল মশারি করে দিলেন, সেই সঙ্গে সাটিনের বালিশ, তাকিয়া পর্যন্ত। ভগবতী সারাদিন ঘরে বসে খায়, রাতে মশারির তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে জাবর কাটে আর ঘুমোয়। তার এই তাগড়াই চেহারা হয়েছে। মোটা হয়ে গরমে হাঁসফাঁস করলে ভক্তরা তাকে হাতপাখার বাতাস করে ঠান্ডা রাখে। সাহাগঞ্জে 'ভগবতী বিদ্যালয়' নামে ইস্কুল খোলা হল। 'ভগবতী তৈল' নামে একটা বাতের মালিশ বেরিয়ে গেল।

তখন কিছুদিনের জন্য ভগবতী গরু আর বিধু দারোগার কথা ছাড়া লোকের মুখে অন্য কথা নেই। বিক্রি মন্দা বলে সার্কাসওলা তাঁবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কাছে-পিঠে আর বাঘ-ভালুকও নেই যে ভগবতী গিয়ে গুঁতোবে। খেতে খেতে চোয়াল ব্যথা।

বিধু দারোগার দশাও তাই। চোর নেই, ডাকাত নেই। শুয়ে বসে গতরে জং ধরে গেল। লোকে রোজ পাঁটা, মুর্গি, ডিম, তরি-তরকারি, মাছ দিয়ে যায়। খেতে-খেতে খিদে মরে গেছে। বহুকাল আর খিদে পায় না বিধু দারোগার। খাবার দেখলে হাই ওঠে। দারোগার ঘোড়াটার পর্যন্ত পায়ে চর্বি জমেছে। নিয়ম মাফিক রোজ একবার বিধু দারোগা ঘোড়ার পিঠে চড়ে গঞ্জে চক্কর মারেন। নাঃ, কোথাও কোনো হাঙ্গামা হয়নি। বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে থানার দাওয়ায় বসে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানেন তিনি।

একদিন সকালে একটা লোক আধমণ ওজনের একটা পাকা রুইমাছ নিয়ে এসে দারোগা সাহেবকে প্রণাম করে হাতজোড় করে সামনে বসল। বিধু দারোগা প্রকাণ্ড মাছটা দেখে অরুচিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটা ভাবল, দারোগা সাহেবের বুঝি এত ছোটো মাছ পছন্দ হয়নি, তাই ভয় খেয়ে মিনমিন করে বলল, "বড়বাবু, আমার পুকুরে এর চেয়ে বড় মাছ আর নেই। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমার মাছটাও পুঁটিমাছের মতো ছোটো, তবু যদি আপনার ভোগে লাগে তো—"

বিধু দারোগা ফস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "খিদে পায়না যে বাপ, আমার যে আর খিদে পায় না। বড্ড অরুচি।"

লোকটা ফের একটা প্রণাম করে বলে, "বড়বাবু, অপরাধ নেবেন না, তা যদি বলেন তো বলি, ঠাকুর দেবতারাও কোন জন্মে অমৃত খেয়ে গ্যাট হয়ে বসে আছেন, খিদে তো তাঁদেরও পাওয়ার কথা নয়। তবু কি লোকে ভোগ নৈবিদ্যি দিতে ছাড়ে! ভক্তদের মুখ চেয়েই তাঁরা অরুচি নিয়েও খান। আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তবু জন্মেও শুনিনি যে রাজা-জমিদার কিংবা লাট বা দারোগার কখনো খিদে পেয়েছে। খিদে তাঁদের কখনো পায় না, দেবতুল্য লোক সব। তবু খেতে হয়, আমাদের মুখ চেয়েই। আমাদের মতো ছোটোলোক হাঘরেদেরই যত খিদে হুজুর।"

লোকটা লাট আর দারোগা একসঙ্গে বলায় দারোগা-সাহেব খুশী হলেন। একটু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয় বটে, তবে টাকটা যেন একটু চকচক করে উঠল, গালের মাংসে একটু ঢেউ দিল, ভুঁড়িটা কয়েকবার কেঁপে উঠল। হাসি নয়, অথচ যেন হাসি। আবার একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "খিদেই বা পাবে কী করে! নড়াচড়া নেই, কাজকর্ম নেই, একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, তোরাই বা সব কেমনধারা মানুষ, দারোগাবাবুর খিদে পায় না শুনছিস, সেজন্যও তো একটু শখ করে চুরি-চামারি করতে পারিস। চোর-ছ্যাঁচড়ের পিছনে হাঁক ডাক দৌড়োদৌড়ি করতে-করতে আমারও একটু খিদের মতো হয় তাহলে। কেমন নির্দয় মানুষ তোরা, অ্যাঁ?"

শুনে লোকটা কান পর্যন্ত হাসল। ফের একটা প্রণাম ঠুকে বলল, "আজ্ঞে বড়বাবু, সেই জন্যই আসা। সফরগঞ্জে শ্মশানের ধারে কসারবনের মধ্যে বুড়ো বটের তলায় এক কাপালিক এসে থানা গেড়েছে ক'দিন হল। বড় সাঙ্ঘাতিক লোক। বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছি, আজ অমাবস্যার রাতে সেখানে নরবলি হবে। বড় ভয়ে-ভয়ে আছি আমরা।"

শুনে বিধু দারোগা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "বটে!"

সেই হুঙ্কারে গঞ্জের বাড়িঘর কেঁপে উঠল, ঘোড়াটা 'চিঁহি' ডেকে লাফিয়ে উঠল, ধারেকাছের লোকজন সব সাঁত সাঁত করে লুকিয়ে পড়তে লাগল, বাচ্চারা কঁকিয়ে উঠল, বেড়াল পালাল, কুকুর কেঁদে উঠল, আর কাকগুলো বন্দুকের আওয়াজ ভেবে কা-কা করে ভিড় করতে লাগল আশে পাশে। যে লোকটা মাছ নিয়ে এসেছিল তারও একটু মূর্ছামতো হয়েছিল, খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে সে চোখ মেলে বড় সুখে হাসল। হ্যাঁ, এই হল গিয়ে আসল দারোগা। আবার একটা প্রণাম করল সে।

অমাবস্যার নিশুতি রাতে দারোগাবাবু ঘোড়ায় চেপে সফরগঞ্জের শ্মশানে চললেন। সঙ্গে বিস্তর সিপাই, অনেক লোকজন। তাদের হুঙ্কারে শেয়াল পালাল, পাখিরা ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি করতে লাগল। খটাস, ভাম, বেজী, খরগোশ সব জঙ্গলের ছোট ছোট জীব গর্তে সেঁদিয়ে কাঁপতে লাগল। বিধু দারোগা বুড়ো বটগাছের তলায় এসে হাঁক ছাড়লেন, "কোথায় কাপালিক?"

কাপালিক নেই। দারোগাবাবু পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জেবলে দেখলেন, খবরটা মিথ্যে নয়। নিভু-নিভু হয়ে একটা ধুনি তখনো জ্বলছে, আশে পাশে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেল, একটা চকচকে খাঁড়া পড়ে আছে, এক-পাশে একটা হাঁড়িকাঠও রয়েছে। দারোগাবাবু পিস্তল বের করে ফের হাঁক দিলেন, "কোথায় গেল সেই হারামজাদা কাপালিকটা?"

তাই তো! কোথায় পালাল! সবাই ভাবছে।

এমন সময়ে গাছের মগডাল থেকে করুণ স্বরে কে যেন বলে উঠল, "হুজুর, আমি এইখানে। ভয়ের চোটে বড্ড উঁচু গাছে উঠে পড়েছি, এখন নামতে পারছি না। বাতিটা একটু ধরুন।"

অবাক হয়ে দারোগাবাবু উঁচুতে আলো ফেললেন। বটগাছের ঝুড়ি আর পাতার ফাঁক দিয়ে অনেক উঁচুতে কাপালিকের লাল কাপড় দেখা গেল, আর দাড়িগোঁফ। দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—নেমে আয়।

সিরিঙ্গে চেহারার কাপালিকটা সাবধানে নেমে এল। টর্চের আলো মুখে পড়তেই চোখ পিটপিট করে ভারী ভিতু চোখে চাইল, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগা-বাবুর ঘোড়ার পায়ের ওপর, বলতে লাগল "বড়বাবু মাপ করুন।" লোকটার চেহারা-আর ভাবভঙ্গী দেখে বিধু দারোগা হতাশ হয়ে বললেন, "তোর বাঘ কই?"

"আজ্ঞে আপনাকে দেখে ভয় খেয়ে ঐদিকের একটা

আমগাছে হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠে বসে আছে। বড্ড ভিতু।"

দারোগাবাবু করাল চোখে চেয়ে বললেন, "আর নরবলি যাকে দিবি সে-লোকটা কোথায়?"

কাপালিক কেঁদে উঠে বলল, "কোথায় নরবলি হুজুর! কত লোককে সাধ্য সাধনা করলাম, পায়ে ধরলাম, ভয় দেখালাম, কেউ রাজি হল না। তাদেরও দোষ দিই না, বলি হতে কে-ই বা সহজে রাজি হয়! হুজুর, বলির কথা না রটালে লোকে সমীহ করে না। তাই রটিয়েছিলাম। কিন্তু, আমি আসলে কাপালিক-টাপালিক নই হুজুর, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি সেই রিং মাস্টার।"

রিং মাস্টার! সবাই হাঁ হয়ে গেল। তাই তো! দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে রিং মাস্টারকে তো চেনা যাচ্ছে একটু-একটু। রিং মাস্টার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "হারু মণ্ডলের গুণ্ডা গরুর তাড়া খেয়ে আমার বাঘটা সেই যে পালিয়েছিল তাইতে আমার আর বাঘের খুব বদনাম হয়ে যায়। তাই সার্কাস থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে খিদের জ্বালায় দুজনে জ্বলে পুড়ে মরছি। নরবলি-টলি ওসব বাজে কথা, আমরা দুজনেই ভারী ভিতু জীব বড়বাবু।"

দারোগাবাবু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয়। তবে তাঁর ভুরু চমকাল, কানটা যেন নড়ে উঠল, গোঁফের ডগা নিচু থেকে ওপরে উঠে গেল। হাসলেন না, তবু যেন হাসলেন। টর্চের আলোয় সবাই দেখল।

রিং মাস্টার আর তার বাঘকে গ্রেফতার করে আনা হল থানায়। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। রিং মাস্টারের দাড়ি চুল সব কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানার হাতায় কদমগাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা বাঘটা লজ্জায় থাবায় মুখ লুকিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে।

হারু মণ্ডল দারোগাবাবুকে প্রণাম ঠুকে বলল, "হুজুর, আমার একটা আর্জি আছে আপনার বরাবর। আমার ভগবতী কিছু খেতে চায় না। খেলার সঙ্গী নেই বলে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না, তাই খিদে হয় না। গাঁ-গঞ্জের ষাঁড় গরু সবাই ওকে ভয় খায়, তাই কেউ মেশে না ওর সঙ্গে। তাই বলি, হুজুর, বাঘটা আমায় দিয়ে দিন। ভগবতী ওকে ঢুঁ মেরে-মেরে খেলবে। তাতে ওর খিদে হবে। আমি বরং বাঘের দাম বাবদ একশো টাকা ধরে দিচ্ছি।"

তো তাই হল। হারু মণ্ডল দড়ি বেঁধে বাঘটাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে নিয়ে গেল। পথে লোকজনকে ডেকে ডেকে বলল, "সস্তায় বাঘ কিনলাম হে।"

কিন্তু ভগবতী মোটা হয়ে যাওয়ার পর থেকে খুব অলস হয়ে পড়েছিল। বাঘটাকে দেখেও তেড়ে টেড়ে গেল না, কেবল একটা ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। সেই শ্বাসের শব্দে বাঘটা পালাতে যাচ্ছিল, হারু মণ্ডল তাকে খড়মপেটা করে টেনে আনল ফের। ভগবতীর গোয়ালেই বেঁধে রাখল তাকে।

সেই থেকে বাঘটা গোয়ালেই থাকে। মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড়মাখা ভাত খায়। মাঝে মাঝে ভগবতীর জাবনার গামলাতেও মুখ দিয়ে বিস্বাদে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু চেষ্টা রাখে। ভগবতী স্নেহভরে মাঝে-মাঝে বাঘটার গা চেটে দেয়। বাঘটা থাবা দিয়ে ভগবতীর পিঠ চুলকোয়।

দেশসুদ্ধু লোক ভেঙে পড়ে দেখতে। হুঁ বাবা, বাঘে গরুতে এক গোয়ালে থাকে! দুকড়ি কবিয়াল গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়, "বিধুর নামে দাওরে জয়ধ্বনি॥ বিধু মোদের নয়নের মণি॥ ভগবতীর নামে দাও গো জয় জোকার॥ তাঁর গোহালে বাঘের কারাগার॥ জয় জয় বিধু ভাগ্যবান॥ রাতির বেলায় দিনের আলো, দিনেজ্যোৎস্নার বান......"

শুনে বিধু দারোগা হাসেন। না, হাসি নয় ঠিক। তাঁর গোঁফের ডগায় যেন হাসি দোল খায়, চোখের মণির ভিতরে যেন ঝিকমিক করে, ভুঁড়িটা কেঁপে ওঠে, নাকের ডগা নড়ে, কান দুটো ফড়িঙের পাখনার মতো থিরথির করে ওঠে। হাসেন না। তবু যেন হাসেন।

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

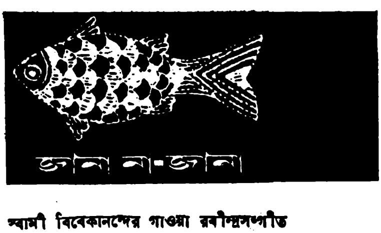

স্বামী বিবেকানন্দের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় সমান-বয়সী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ৭ মে ১৮৬১; বিবেকানন্দের জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ সালে। এই দুই মনীষীর কখনও দেখা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। স্বামীজীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কিছু লেখায় ও চিঠিতে। স্বামীজীর মৃত্যু হয় ৪ জুলাই ১৯০২ সালে, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪১ বছর, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তখনও খুব বিখ্যাত হন নি। তাই বোধ হয় স্বামীজীর লেখায় রবীন্দ্রনাথের কথা নেই, বরং তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার আগে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-সভায় তিনি নিয়মিত গান করতেন। সেসব ব্রহ্মসংগীতের অনেকগুলিরই লেখক ঠাকুর-পরিবারের মানুষেরা, যেমন—দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ খুব ভালো গায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁর গাওয়া গানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। যেমন—(১) তাঁহারে আরতি করে (স্বরবিতান—২২), (২) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা (স্ব—২৩), (৩) সত্যমঙ্গল প্রেমময় (স্ব—২৩), (৪) এ কী এ সুন্দর শোভা (স্ব—২৩), (৫) যোগী হে (স্ব—২০), (৬) তুমি বন্ধু তুমি নাথ (স্ব—৪), (৭) মহাসিংহাসনে বসি (স্ব—৮), (৮) দুখ দূরে করিলে (স্ব—২৫), (৯) তুমি কি গো পিতা (স্ব—৪৫)। বোধহয় খুঁজলে আরও রবীন্দ্রসংগীত পাওয়া যাবে যা বিবেকানন্দ গাইতেন, যেসব গান তাঁর প্রিয় ছিল।

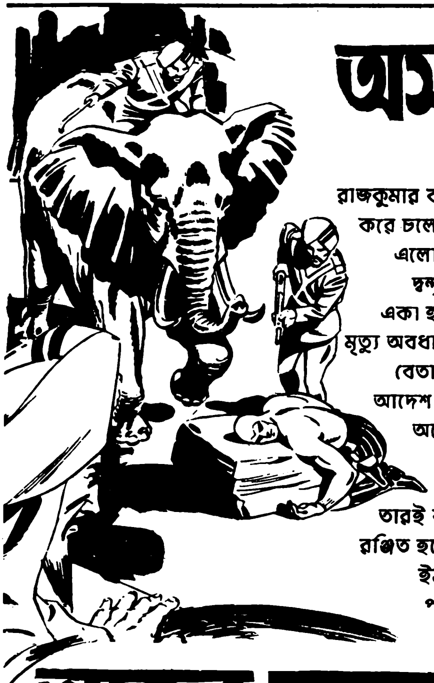

অসহায় কে?

১লা জানুয়ারী ১৯৭৬

রাজকুমার কাহারানের দস্যুদল অরণ্যে লুঠতরাজ
করে চলে। এই অরাজকতার রাজ্যে একলা
এলো বেতাল দুর্বৃত্ত দমনের জন্য।
দ্বন্দ্বক্ষেত্রে দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে দেখে নিরস্ত্র বেতাল
একা হাতে লড়ে চলেছে হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে।
মৃত্যু অবধারিত তার। কাহারান উপেক্ষা করলো
বেতালের সাবধান বাণী—
আদেশ দিল মৃত্যুদণ্ডের। সত্যিই কি অমর,
অজেয় বেতালের শেষ হবে এবার?
অরণ্যে মৃত্যুর পাশে পাশে চলে ভ্রাতৃত্ব ও
আত্মত্যাগের পারম্পরিক ঐতিহ্য।
তারই কাহিনী নানা রঙে ও কল্পনায়
রঞ্জিত হয়ে আসছে ১লা জানুয়ারী ১৯৭৬ এর
ইন্দ্রজাল কমিকসে। প্রত্যেকটি কিশোর
পাঠকের বুকে সাড়া জাগাবে এই সংখ্যা।

ইন্দ্রজাল কমিকস্

মূল্য: ১ টাকা

আজব দস্যু

১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৬

আন্তর্গোয়েন্দা—বিশ্বজোড়া এই দুর্বৃত্তদমন সংস্থার
সদর দপ্তরে প্রচণ্ড আলোড়ন। চোর ঢুকেছে।
গোপন কাগজপত্র লোপাট, অথচ প্রহরার ঢিলে
পড়েনি কোথাও। প্রত্যেকটি কর্মীকে ভালো করে
তল্লাসী করে ছাড়া হয়। ম্যানড্রেকের ডাক পড়লো।
কিন্তু আবার আধঘণ্টার মধ্যেই আবার চুরি।
কে এই চোর? রহস্য ঘনায়, রোমাঞ্চ বাড়ে।
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উত্তেজনায় ভরপুর।

শেষ হয়ে গেলে আর পাবেন কোথায় এই
আশ্চর্য্য ম্যানড্রেক কাহিনী? ১৫ই জানুয়ারী
১৯৭৬ সংখ্যা—ইন্দ্রজাল কমিকসের। আজই বলে রাখুন।

টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া প্রকাশন।

TIMES ART

ম্যাজিকের মত

পার্থসারথি চক্রবর্তী

অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। মিশর দেশের মন্দিরের পুরোহিতেরা ভক্তদের এমন সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখাতেন যে, সবাই অবাক হয়ে যেত। ভক্তের দল ভাবত, পুরোহিতেরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরিত দূত।

মিশরের এই সমস্ত পুরোহিত ভক্তদের কাছে বলতেন, "ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ধূপধুনো জেলে পুজো আরম্ভ করলে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে মন্দিরের দরজা খুলে দেবেন।" আর অবাক কাণ্ড, সত্যি সত্যি ও'রা যখন বেদীর উপর ধূপধুনো জ্বালিয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের বিরাট দরজা ম্যাজিকের মত্রে আপনা-আপনি খুলে যেত। আর সাধারণ লোকেরা এই ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে যেত।

আসলে কিন্তু এইসব পুরোহিত যা দেখাতেন তা মোটেই অলৌকিক নয়। এর পিছনের মূল ভূমিকা ছিল, রসায়নশাস্ত্রের। পুরোহিতদের অনেকেই খুব ভালো বিজ্ঞান জানতেন। কেউ-কেউ পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বিজ্ঞানের নানারকম ভেলকিবাজি সুকৌশলে দেখিয়ে এ'রা সবাইকে অবাক করে দিতেন। সাধারণ লোকে এতসব বুঝতো না। তারা ব্যাপারগুলোকে ঈশ্বরের অসীম করুণা ও আশীর্বাদ বলে মেনে নিত।

কেমন করে মন্দিরের অত বড় বিরাট দরজা আপনা থেকেই খুলে যেত এবার তা বলছি। মন্দিরের দরজার সামনে ধাতুর একটা ফাঁপা বেদী ছিল। এর নীচের অংশটা ফাঁপা। ধূপধুনো জ্বালিয়ে পুজো আরম্ভ করলে ঐ বেদীর নীচের বাতাস গরম হয়ে মেঝের নীচে লুকিয়ে রাখা একটা জলের পাত্রের উপর খুব বেশী করে চাপ দিত। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাত্র থেকে জল বেরিয়ে আর-একটা খোলা বালতির ভিতর গিয়ে পড়ত। ঐ বালতিটা ভারী হয়ে নীচেয় নামতো, সেই সঙ্গে বালতির সঙ্গে আটকানো এবং দরজার নীচের কাঠের সঙ্গে জড়ানো প্যাঁচটাও খুলে যেত। আর অমনি মন্দিরের দরজা সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হত।

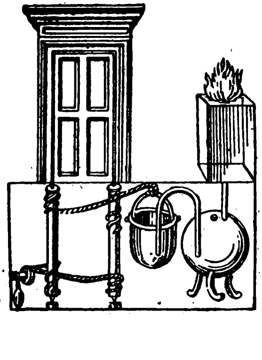

ম্যাজিক

যাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

ম্যানচেস্টার বার্মিংহাম বা সাউথহলের কয়েকটা জায়গা দেখলে মনে হয় যেন পাঞ্জাবে চলে এসেছি। ভারতীয়রা সেখানে গিজগিজ করছে। আমার বন্ধু-বান্ধব অনেক ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার, উচ্চশিক্ষার্থে এখানে এসেছে। আর সেজন্য রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ 'অ্যাই প্রদীপ' হাঁকটা প্রায়ই শুনতে হয়।

রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছিলাম। সদলবলে প্লেটের খাবার পেটে পুরে অদৃশ্য করছি; ঠিক সেই সময়ে কানে এলো ঐ পরিচিত আওয়াজ, "অ্যাই প্রদীপ।" পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার স্কুলে-পড়া বন্ধু দীনেশ রায়। দীনেশের সঙ্গে সেই কবে শেষ দেখা, কতো বছর আগে হঠাৎ ও কেমন যেন উপে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে দেখা হওয়াতে খুব মজা লাগছিল। জানলাম, ও বহু বছর বিলেতে আছে এবং ডাক্তার হয়েছে। দীনেশ রায় এখন "ডক্টর ড্যানিশ রে" হিসেবে খুব সুনাম করেছে।

অনেক গল্প-গুজবের পর শুরু হল আসল ব্যাপার। সবাই মিলে ধরে বসল, ম্যাজিক দেখাতে হবে। আমি জানতাম, ম্যাজিকের পর্ব আসবেই। সেজন্য মনে মনে প্রস্তুতও ছিলাম। বললাম, "এখানকার রয়্যালটি থিয়েটারে আমার শো হচ্ছে, চলে আসুন সবাই একদিন।" তারাও এককাঠি উপরে। একজন বললেন, "সে তো দেখবই, কিন্তু এখন একটা চাই।" আমি বুঝলাম, কোনও উপায় নেই, দেখাতেই হবে। পকেট থেকে ডায়েরিটা বার করে নিয়ে বললাম, "আমায় একটু হিসেব করতে হবে। হিসেবটা সেরে নিই তারপর দেখাচ্ছি।" ডায়েরিটা বার করে আমি আমার কাজ সেরে নিলাম।

একটু পরে ডায়েরি আর কলমটা দীনেশের হাতে দিয়ে চার রাশির যে-কোনও একটা সংখ্যা লিখতে বললাম। আর তারপর বললাম, সে যেন অন্য কাউকে সংখ্যাটা না বলে। সবার আড়ালে সেই ডায়েরিতে সে তার মনের মতো একটা সংখ্যা লিখলো। তারপর দ্বিতীয়জনকে একইভাবে আর-একটা সংখ্যা সেই আগের সংখ্যাটার তলায় লিখতে বললাম। তার লেখা হয়ে গেলে তৃতীয়জনকে লিখতে দিলাম, তারপর চতুর্থজনকে। এইভাবে চারজন মিলে পরপর চারটে সংখ্যা লিখলেন। এই সংখ্যা চারটেকে এবার আমি পঞ্চম অর্থাৎ শেষ ব্যক্তির কাছে দিয়ে বললাম, "এগুলো যোগ করলে কত হয় বলুন।" তিনি যোগ করে যোগফলটা বললেন। আমি তখন ডায়েরির ঠিক শেষ পাতাটা উল্টিয়ে দেখালাম—আগের থেকেই সেখানে যোগফলটা লেখা রয়েছে। সবাই অবাক, আমি আগের থেকে তাঁদের সংখ্যার যোগফল জানলাম কী করে?!

এই ম্যাজিকটার কৌশল কিন্তু ভীষণ সহজ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। আমি সবার আগে যখন হিসেব করছিলাম তখন ডায়েরির একটা পাতায় ইচ্ছেমতো চার রাশির চারটে সংখ্যা পর পর লিখে রেখেছিলাম। ধরো লিখেছিলাম

1 5 2 9
4 6 5 7
6 0 3 8
2 2 4 1

এই সংখ্যাগুলো লেখবার পর সেগুলোর যোগফলটাকে অর্থাৎ 14465 এই সংখ্যাটাকে ডায়েরির শেষ পাতায় লিখে রেখেছিলাম। ব্যাস, এই ছিল আমার প্রস্তুতি।

তারা চারজন যখন তাদের ইচ্ছেমতো সংখ্যা লিখতে এল, তখন আমি তাদের জন্য ডায়েরির অন্য একটা পাতা দিলাম। তাদের লেখা হয়ে যাবার পর পঞ্চমজনকে যখন যোগ করতে দেওয়া হলো তখন ডায়েরির পাতা উল্টিয়ে যে পাতায় আমি আগের থেকে সংখ্যা চারটে লিখে রেখেছিলাম সেই পাতাটা মেলে ধরলাম। পঞ্চমজন তো আর জানে না আগের চার জন কী কী সংখ্যা লিখেছে এবং এগুলো বেমালুম অন্য সংখ্যা। সেজন্য নিঃসন্দেহে সে আমার লেখা সংখ্যাগুলোই যোগ করতে আরম্ভ করল। আর তার যোগফল তো ডায়েরির পেছনে লেখাই আছে। সুতরাং সবাইকে অবাক করতে আর কিছুই দরকার নেই। আশা করছি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ।

তোমরা যখন খেলাটা দেখাবে তখন চেষ্টা করো বেশী সংখ্যক দর্শকের সামনে দেখাতে। সেই সঙ্গে লক্ষ রাখবে, যাঁরা সংখ্যা লিখবেন, তাঁরা যেন একটু দূরে দূরে থাকেন। তাহলে একজন অন্য জনের সংখ্যা জানতে পারবেন না এবং ডায়েরির পাতাটা উল্টোতেও তোমার সুবিধে হবে।

গড়ের মাঠে ট্রাম ছুটেছে

আমাদের কলকাতা

রত্নাকর

শমী আর শমীর ছোটমামা ভোরের প্রথম ট্রামে উঠতেই ট্রামটা ছুটতে শুরু করে দিল, ঘটা-টাং… ঘটা-টাং…ঘটা-টাং…উরিব্বাস কী জোরে! রাস্তা ধরতে গেলে একদম ফাঁকা। ট্রামে, রাস্তায় অল্প লোক, আর সবার চোখই কেমন ঘুম-ঘুম। বোধ হয় এইমাত্তর সবাই ঘুম থেকে উঠেছে। শমী এতো ঘুম-থেকে-ওঠা লোক কক্ষনো একসঙ্গে দেখেনি, ওর খুব মজা লাগতে লাগল।

ছোটমামা জিজ্ঞেস করল, "কীরে কেমন লাগছে?" শমী রাস্তার দিক থেকে চোখ না-ফিরিয়েই উত্তর দিল, "ভীষণ ভালো।" এই রাস্তা, দোকানপাট, বাড়িঘর ও কদ্দিন দেখেছে, কিন্তু এই ভোরবেলায় সবকিছু কেমন যেন নতুন-নতুন।

ধর্মতলায় পৌঁছে শমী আরও অবাক হয়ে গেল। ওমা! কতো পাখি—শালিখ, চড়ুই, কাক। ট্রামের তারে, রাস্তায় পাখির মেলা। ওর মনে হলো ওদের ষষ্ঠীতলার সব পাখি ধর্মতলায় বেড়াতে এসেছে।

"ছোটমামা, পাখিগুলো কোথায় থাকে?" ছোটমামা বলল, "আশেপাশে কতো বড়-বড় গাছ আছে, সেখানেই ওদের বাসা, দেখবি?"

শমী আর ছোটমামা আর একটা ট্রামে উঠল। ট্রামটা ছুটতে লাগল কী সুন্দর একটা রাস্তার ওপর দিয়ে। দুদিকে কতো বড়-বড় গাছ, বিশাল সবুজ মাঠ; রেলিং দিয়ে ঘেরা দুটো চমৎকার পুকুরও চোখে পড়ল। শমীর মেজদি থাকে কানাডায়, পরশুদিন সেখান থেকে একটা ছবিওলা পোসট্কার্ডে চিঠি এসেছে শমীর নামে। ছবিটা কী সুন্দর! ঠিক এই রকম রাস্তা, গাছ, মাঠ আর পুকুরের ছবি।

ছোটমামা বলল, "চেষ্টা করলেই কলকাতার আরও অনেক রাস্তা এর চাইতেও সুন্দর করে তোলা যায়।"

শমী বলল, "জানো, কানাডাতেও না ঠিক এই রকম একটা রাস্তা আছে, দুদিকে লাইন-দিয়ে-দাঁড়ানো লম্বা-লম্বা গাছ, সবুজ মাঠ, রেলিং ঘেরা পুকুর, ঠিক এই রকম।" শুনে ছোটমামা অবাক হয়ে গেল, "কী করে জানলি?" শমী বলল, "বারে, তুমি মেজদির পোসট্কারড্টা দেখোনি, ঠিক এইরকম না?" ছোটমামা ছবিটার কথা একটু মনে করে নিয়ে উত্তর দিল, "সত্যিই তো।"

ছোটমামার দুটো ক্যামেরা আছে। কী ভালো ছবি তোলে ছোটমামা। শমী বলল, "তুমি আমাকে এখানকার একটা ছবি তুলে দেবে?" "দেবো।" শমী বলল, "সেই ছবিটার পেছনে আমি মেজদিকে একটা চিঠি লিখব। লিখব, মেজদি, চিঠির উল্টোদিকের ছবিটা কোথাকার বলতো? ঠিক তোমাদের ওখানকার মতো রাস্তা, গাছপালা, মাঠ আর পুকুরের ছবি। যদি ঠিক-ঠিক বলতে পারো, তাহলে পরের বার তোমাকে আরও সুন্দর একটা ছবি পাঠাবো।"

বিমল কর

কাপালিকেরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

তারাপদ থাকত কলকাতায়। মেসবাড়িতে। একদিন সে হঠাৎ জানতে পারল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তার ভাগ্যে নাচছে। ভদ্রলোক নাকি তারাপদর এক পিসেমশাই। মধুপুরের কাছে শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ বন্ধু চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সঙ্গে, নাম তাঁর কিঙ্করকিশোর রায়, ছোট করে 'কিকিরা'।

শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণের বাড়িতে এসে তারাপদ তার পরিচিত সাধুমামাকে দেখতে পেল। কিন্তু সাধুমামা বোবা হয়ে থাকলেন।

সন্ধেবেলায় এক রহস্যময় ঘরে আরও রহস্যজনক অবস্থায় ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা হল। এই ঘরে তিনি মৃতজনের আত্মাকে ডেকে নিয়ে আসেন।

সেই ঘরে ভুজঙ্গভূষণ তারাপদর মা-বাবার আত্মাকে হাজির করালেন। তারাপদ বিচলিত হয়ে পড়ল। চন্দন তাকে বোঝাতে পারছিল না, হয়ত এটা কোনো রকমের ভেলকি। সেই রহস্যময় অন্ধকার ঘরে আবার একদিন তারাপদর মৃত ছোট্ট বোনটির আত্মা এল নেমে। তারাপদ একেবারে ভেঙে পড়ল।

ভুজঙ্গভূষণ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তারাপদ তার মৃত ছোট বোন পরীর আত্মাকে ঘরের মধ্যে আনতে বলল, পরী যে এসেছিল তার কোনো চিহ্ন সে দেখতে চায়। ভুজঙ্গভূষণ পরীর আত্মাকে ঘরে আনালেন। সে যে এসেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে তারাপদ নাকের সামনে ফুলের গন্ধ পেল। আর যাবার সময় পরী তার আঙুলের ছাঁচ রেখে গেল ঘরে। মোমের ছাঁচ। তারাপদর মনে আর কোনো সন্দেহ থাকল না যে, আত্মারা সত্যি-সত্যিই আসে।

॥ দশ ॥

সকালে তারাপদর আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ঘুম ভেঙে যাবার পরেও সে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। শরীর যেন ভেঙে যাচ্ছে, হাত পা ভার, চোখ জ্বালা করছিল। সারা রাত জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকার পর সকালে ঘুম ভাঙলে যেমন লাগে, সেই রকম লাগছিল। শরীরের দোষ নেই, আজ কদিনই একটা-না-একটা এমন কিছু ঘটে যাচ্ছে যাতে মাথার ঠিক থাকে না, একের পর এক ভাবনা সারাক্ষণ জট পাকিয়ে থাকে মাথায়। রাত্রে ঘুম হয় না ভাল করে। তার ওপর কালকের ঘটনার পর তারাপদ একেবারেই ঘুমোতে পারেনি। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে, মাঝেমাঝেই কেঁদে উঠেছে বাবা-মা-পরীর কথা ভেবে। তবু বাবা কিংবা মা তাকে এমন করে বিহ্বল করে যায়নি। পরীই যেন সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল। তার আত্মা তারাপদর গায়ের কাছে, সামনেই এসে দাঁড়াল, গন্ধ শুঁকিয়ে দিল, চুলের ছোঁয়া দিল মুহূর্তের জন্যে, একটা মোমের আঙুলও রেখে গেল চিহ্ন হিসেবে। এরপর তারাপদ কেমন করে স্থির থাকবে! সে কাকে বোঝাবে, এই ছোট্ট বোনটিকে সে কতদিন কোলে করে একটু বসে থাকার জন্যে মায়ের কাছে আব্দার করত! পরী তখন চার ছ'মাসের বাচ্চা! ওইটুকু বাচ্চা কিছুই তো বোঝে না, তবু তারাপদ বিকেলে খেলাধুলো ছেড়ে বোনের পাশে শুয়ে-শুয়ে কাগজের ফুল দোলিয়েছে, ঝুমঝুমি নেড়েছে, প্রাণপণে ছড়া কেটেছে। পরী আরও যখন বড় হল একটু, তারাপদ বোনকে বসতে, পা-পা করে হাঁটতে, একটা দুটো আধো-আধো কথা বলতে শিখিয়েছিল। সেই বোন যখন থাকল না—তখন তারাপদর বুক ভেঙে গিয়েছিল। সমস্ত বাড়ি অসাড় থাকত তখন; মা আড়ালে বসে কাঁদত, বাবা কেমন পাথরের মতন হয়ে গিয়েছিল, আর তারাপদ বেড়াল-ছানার মতন সারা বাড়ি কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াত।

সেই পরী কাল এসেছিল। তারাপদ তাকে চোখে দেখতে পেল না বটে, তবে আসার প্রমাণ তো পেল। পরী আজও কোথাও-না-কোথাও রয়েছে এটা জানার পর বুকের মধ্যে কেমন হয় এ-কথা শুধু তারাপদই বুঝতে পারে। আর কেউ বুঝবে না।

মাঝরাত পর্যন্ত চন্দনকে জ্বালিয়ে শেষরাতে তারাপদ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর এখন উঠল বেশ খানিকটা বেলায়, ঘরে রোদ ঢুকে পড়ার পর।

কুমুর কীর্তি

সেদিন দুপুরে না-ঘুমিয়ে কুমু বাগানে মাটি খুঁড়ছিল একমনে। তার দাদা দেখতে পেয়ে ছুটে এল।

–কি করছিস রে কুমু? মাটি খুঁড়ে?

–ভুগভ্যো রেল বানাচ্ছি।

–তার মানে?

–আহা, ধেড়ে ছেলে ভুগভ্যো রেল জাননা? মাটির তলা দিয়ে রেল গাড়ি ছুটে চলে হুস্ হুস্। পৃথিবীর কত দেশে আছে। কলকাতাতেও হবে।

–তুই কি করে জানলিরে পাকা বুড়ি?

–জানি। বাবা বলেছে। ভুগভ্যো রেল হলে বাবাকে আর ভীড় ঠেলে ট্রামে বাসে উঠতে হবে না। রেলে চাপলেই হুউস্ করে পৌঁছে দিয়ে যাবে স্টেশনে। রোজ কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে বাবা। কি মজা হবে তখন। তাই না?

MTP কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

চন্দন বিছানায় নেই। অনেক আগেই বোধ হয় উঠে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠল তারাপদ, অনেকটা জ্বরো রোগীর মতন বেখেয়ালে মুখটুখ ধুয়ে এল। একজনকে দেখতে পেয়ে চা দিতে বলল রুক্ষ গলায়। কেন যে রুক্ষ হল নিজেও বুঝল না।

ঘরে বসে যখন চা খাচ্ছে তারাপদ, চন্দন এল।

"ঘুম ভাঙল তোর?" চন্দন বলল।

"হ্যাঁ। তুই কোথায় গিয়েছিলি?"

চন্দন হাত বাড়িয়ে নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা ঢেলে নিল; কথা বলল না প্রথমটায়, তারপর বলল, "রোগী দেখতে!"

অবাক হয়ে তারাপদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

চন্দন বলল, "সাধুমামার বুকে ব্যথা উঠেছিল।"

"সাধুমামার?"

"ভোর রাতে আমায় মৃত্যুঞ্জয় ডাকতে এসেছিল। তোকে আর আমি জাগাইনি। একটু আগে আর একবার দেখতে গিয়েছিলাম সাধুমামাকে।"

তারাপদ উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কী হয়েছে সাধু-মামার? কেমন আছে?"

"ভালই আছেন এখন!"

"বুকে ব্যথা কেন? হার্টের গোলমাল?"

চন্দন পরপর দু চুমুক চা খেল। সিগারেটও ধরাল একটা। শেষে হেঁয়ালি করেই যেন বলল, "হতে পারে।"

"হতে পারে মানে?"

"বলতে পারছি না। হার্টের গোলমাল ধরা কঠিন। আমার কাছে স্টেথোও নেই। তবে ব্যথাটা হার্টের দিকটাতেই।"

"তোর কাছে তো ওষুধও নেই কিছু?"

"না। দু-চারটে যা এনেছি, তাতেই আপাতত কাজ চালিয়ে দিচ্ছি।"

তারাপদ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সাধুমামার বুকের ব্যথা যদি এতই বেশী তাহলে চন্দন তেমন গা করছে না কেন? আশ্চর্য! যে ডাক্তারের না আছে স্টেথস্কোপ না কোনো ওষুধপত্র, সে-ডাক্তার কেন রোগীর ভার নেবে! তারাপদ বলল, "তুই সবে পাশ করেছিস, তোর কাছে ওষুধপত্র নেই—কেন তুই এই দায়িত্ব মাথায় নিচ্ছিস? সাধুমামা বুড়োমানুষ, একটা-কিছু হয়ে গেলে তখন সামলাতে পারবি না। তার চেয়ে ভুজঙ্গদের বল—কোনো ডাক্তার-টাক্তার ডেকে আনবে।"

চন্দন কথাগুলো কানে শুনেও গা করল না, বলল, "বোকার মতন কথা বলিস না। আমি যেমন ডাক্তারই হই—বিপদে পড়ে কেউ যদি আমায় ডাকতে আসে আমি না বলতে পারি না। তাছাড়া এখানে ধারেকাছে কোনো ডাক্তার নেই। হয় মধুপুর না হয় দেওঘর থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে হবে। তার মানে গোটা একটা দিনের ব্যাপার। তোকে বলেছি না—কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি দু-একটা ইনজেকশানের ওষুধ নিয়ে এসেছিলাম। তার মধ্যে একটা হার্টের ওষুধ ছিল। ভেবেছিলাম ভুজঙ্গ অক্কা পাবার আগে কাজে লাগবে। সাধুমামার দরকারে লেগে গেল।...যাক্ গে, সাধুমামা এখন ঘুমোচ্ছে; ইনজেকশান দিয়ে দিয়েছি ভোর রাতেই। মনে হচ্ছে, কোনো গণ্ডগোল হবে না। এরপর ভুজঙ্গ কী করবে না-করবে তার ব্যাপার। আমার যা করার করেছি, যা বলার মৃত্যুঞ্জয়কে বলেছি।"

তারাপদ চা শেষ করে ফেলল। হাই তুলল আবার। চা খাওয়ার পর সামান্য আরাম লাগছিল।

চন্দন বলল, "একবার কিকিরার কাছে যেতে হবে।"

"কেন?"

"চল্ না; গেলেই বুঝতে পারবি।"

মাথা নাড়ল তারাপদ। "আমার ভাল লাগছে না।"

"এই বাড়িতে বসে-বসেই বা তোর কী ভাল লাগবে?"

কথার জবাব দিল না তারাপদ।

অপেক্ষা করে চন্দন হঠাৎ বলল, "তুই যদি আমার সঙ্গে না যাস, তারা—আমি কিন্তু আর এ-বাড়িতে ফিরব না; কিকিরার কাছে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাব।"

তারাপদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন চন্দনের হঠাৎ এই মত পালটে ফেলার ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে তাকে লক্ষ করতে লাগল।

চন্দনও চা শেষ করে ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল্।"

তারাপদ বলল, "কী হবে কিকিরার কাছে গিয়ে?"

"কী হবে না-হবে তোর কাছে আমি এখন বলব না। যদি তুই না যাস, আমি বুঝব তুই ভুজঙ্গর ফাঁদে ধরা পড়ে গিয়েছিস। আমি আর এখানে থাকব না।"

চন্দনের মুখ দেখেই তারাপদ বুঝতে পারল, ও বাজে কথা বলছে না। সত্যি-সত্যিই তারাপদকে রেখে চন্দন চলে যাবে। ও বরাবরই জেদী, একবার যা ঠিক করে নেয় তার থেকে নড়ানো যায় না। তবু তারাপদ বলল, "কী হল ব্যাপারটা? হঠাৎ তুই এ-রকম করছিস?"

চন্দন চাপা গলায় বলল, "এখানে বসে সব কথা বলা যাবে না। তুই হয় আমার সঙ্গে চল—না হয় তুই এই লাখটাকার সম্পত্তির জন্যে ভুজঙ্গর কাছে বসে থাক—আমি থাকব না।"

তারাপদর কানে কথাটা বড় লাগল। আহত হয়ে বলল, "তুই আমায় এত লোভী ভাবলি?"

চন্দন বলল, "এই বাড়িতে বসে আমি আর একটা কথাও বলব না। যদি তোর ইচ্ছে না থাকে, তুই যাস না। আমি যাচ্ছি।"

তারাপদর সাধ্য হল না চন্দনকে ছেড়ে দেয়। সে স্পষ্টই বুঝল, চন্দন তাকে মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছে না—সত্যিই ও চলে যাবে, যা একগুঁয়ে ছেলে। তাছাড়া তারাপদর সন্দেহ হল, চন্দনের যেন কিছু বলার আছে, গোপনে বলবে। অগত্যা তারাপদ বলল, "বেশ। আমি যাব।"

তারাপদ আর চন্দন বেরিয়ে পড়ল। মৃত্যুঞ্জয় তাদের দেখেছিল, কিছু বলল না। কেউ যে নজর রাখছে, তাও মনে হল না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, "তোকে একটা কথা বলি তারা, কিছু মনে করিস না। ভুজঙ্গ তোকে জব্বর প্যাঁচ মেরে কবজা করে ফেলেছে।"

তারাপদ রেগে গেল। বলল, "কেন? কী করে বুঝলি?"

"বুঝেছি। তোকে আমি বুঝব না? তুই বরাবর নরম-ধাতের। একটুতেই কেঁদে ফেলিস, বুক চাপড়াস,

ছটফট করিস। তোর মতন সেণ্টিমেণ্টাল ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। তোর মনে কোনো জোর নেই।"

চন্দন আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তারাপদ বাধা দিয়ে রাগের গলায় বলল, "লেকচার মারিস না, চাঁদু। আমি অনেক লেকচার শুনেছি।"

"তুই চটে যাচ্ছিস কেন?

"আলবাত চটব। তুই আমায় লোভী বলবি, সেণ্টি-মেণ্টাল বলবি—আর আমি চটব না!"

চন্দন বন্ধুর রাগ দেখে হেসে ফেলল। তারাপদর রাগ ভাঙাবার জন্যে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই মিছেমিছি চটছিস। সকলের মন কি একরকম হয়? কারুর মন শক্ত হয়, কারুর নরম; কেউ নিষ্ঠুর হয় তোর ভুজঙ্গ-পিসেমশাইয়ের মতন, কেউবা সাধুমামার মতন দুর্বল হয়। তোর মন নরম বললে তুই চটবি কেন?"

"তুই আমায় লোভী বলেছিস।"

"লোভ সব মানুষেরই অল্পস্বল্প থাকে, তারা। পড়ে-পাওয়া সম্পত্তির লোভ ভাই আমারও থাকত। যাকগে, তুই লোভী নোস, যা বলেছি—ভুল করে বলেছি। এবার হল তো?"

তারাপদ কোনো কথা বলল না। চন্দন বন্ধুর গলা জড়িয়েই হাঁটতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "ভুজঙ্গ তোকে বশ করে ফেলছে, তারা। ধীরে ধীরে তোকে মুঠোয় পুরে ফেলছে। এরপর তুই আর পালাতে পারবি না, সে-ক্ষমতা তোর থাকবে না। আমিও তোকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

তারাপদ বলল, "যা মনে করিস বল, আমি কিছু বলব না।"

"তুই সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করিস তোর মা-বাবার আত্মা আসে? তুই কি বাস্তবিকই মনে করেছিস—কাল তোর কাছে পরী এসেছিল?"

"হ্যাঁ, পরী এসেছিল।"

"আমি বিশ্বাস করি না। এ অসম্ভব।"

"তুই বিশ্বাস না-করতে পারিস, কিন্তু আমি করি। যদি পরী না আসবে তবে কে আমার নাকের কাছে গন্ধ শুঁকিয়ে যাবে, কার মাথার চুল আমার মুখে লাগবে? কার আঙুলের ছাঁচ পড়ে থাকবে?"

চন্দন বন্ধুর গলা থেকে হাত সরাল। মুখোমুখি তাকাল। বলল, "তুই পাগলের মতন কথা বলছিস। পরী মারা গিয়েছিল ছোট্ট বয়েসে, তুই বলিস বছর দুই-তিন বয়েসে। শোন তারা, যা বলছি ভেবে দেখ। পরী যখন মারা যায় তখন তুই নিজেই ছেলেমানুষ; পরীর ঠিক-ঠিক বয়েস কত হতে পারে তুই জানিস না। দু-তিন বছর হতে পারে, আবার চারও হতে পারে। সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সেই ছোট্ট পরী কি মরে গিয়েও পরলোকে বাড়ছে?"

তারাপদ কথাটা বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

চন্দন বলল, "এটা তো সোজা ব্যাপার। আমরা চেয়ারে বসেছিলাম—ঠিক কিনা বল? একটা তিন চার বছরের মেয়ে মাথায় কত লম্বা হবে রে যে তোকে গন্ধ শুঁকিয়ে যাবে, মুখে চুলের ছোঁয়া দিয়ে যাবে? যদি মেয়েটা কম করেও ফুট চারেকের মতন লম্বা না হয় কখনোই আমরা চেয়ারে বসে থাকার সময় মুখে মাথার চুল ছোঁয়াতে পারে না। এটা সোজা অঙ্কের ব্যাপার। চেয়ারে বসে থাকার সময় আমাদের মুখ মাটি থেকে অন্তত সোয়া তিন সাড়ে তিন ফুট উঁচুতে থাকে, ওই হাইটের কোনো মেয়ে পাশে না দাঁড়ালে তার চুলের ছোঁয়া তোর মুখে লাগতে পারে না। অবশ্য যে-মেয়ে মাথায় আরও লম্বা সে কিন্তু ঘাড় নামিয়ে হেঁট হয়ে তোর মুখে চুলের ছোঁয়া লাগাতে পারে। এবার তুই বল, মারা যাবার পর স্বর্গে গিয়ে পরী কি তোর আমার মতন বছরে-বছরে বাড়ছে? তা যদি বাড়ে—তবে তার বয়েস আজ ষোলো সতেরো হতে পারে।"

তারাপদ বোকার মতন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না। পরীর মুখ কিংবা স্মৃতি যেটুকু মনে আছে তারাপদর, তাতে সেই

ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে কখনোই মাথায় অত লম্বা হতে পারে না। বড় জোর বছর তিনেকের ছিল পরী। সে কতই বা লম্বা হবে? তা ছাড়া তার মাথার চুল ছিল ঝাঁকড়া, কিন্তু বব্ করে ছাঁটা। সেই চুলই বা কেমন করে মুহূর্তের জন্যে পালকের ছোঁয়ার মতন তারাপদর গালে লেগে সরে যাবে? মোমের আঙুলের যে ছাঁচ তারাপদ দেখেছে—সেটাও তো কচি মেয়ের নয়। তাহলে? আত্মারা কি মানুষের মতন পরলোকে গিয়ে বয়েসেও বাড়ে? যদি তা বাড়ত—তবে হাজার-হাজার আত্মার বয়েস শ, দুশ, পাঁচশ বছর হয়ে গেছে।

তারাপদ এ-রকম একটা হেঁয়ালির কোনো কুল-কিনারা খুঁজে পেল না। বলল, "কী জানি, আমি কিছু জানি না। তবে ভুজঙ্গ তো আগেই বলেছে—পরী আর অত ছোট্টটি নেই। আত্মাদের অন্য কোনো ব্যাপার আছে।"

"কোনো ব্যাপার নেই," চন্দন ঘাড় নেড়ে বলল. "আমি তোকে বলছি—যে-মেয়েটি আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসে. আত্মা নামাবার মিডিয়াম হয়—সেই মেয়েটাই কাল পরী সেজে তোর কাছে এসেছিল।"

তারাপদ প্রবলভাবে বাধা দিতে গেল. চন্দন শুনল না। বলল. "মেয়েটার মাথায় অনেক চুল, সব সময় চুল এলো করে থাকে, মাথায় লম্বা, গায়ে রোগা—। তারা, ওই মেয়েই কাল পরী সেজে এসেছিল।"

চন্দন আরও কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। পরে বলল. "কিকিরার কাছে চল। কিকিরা তোকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন ভুজঙ্গ কেমন করে আত্মা নামায়।"

মাঠেঘাটে নয়, কিকিরা বাড়িতে চন্দনদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ি মানে সেই হরিরামের আস্তানা। বালিয়াড়ির আড়ালে মাঠকোঠা ধরনের বাড়ি, দোতলা, কাঠের সিঁড়ি, মাথায় খাপরার চাল। চার দিকেই কিছু-না-কিছু গাছপালা। বাড়ির একপাশে বাঁধানো কুয়ো।

হরিরাম খেতখামার নিয়ে পড়ে থাকত একসময়, ছেলে গোরখপুরে বড়সড় ব্যবসা ফাঁদার পর বাবার কাছে বড় একটা আসতে পারে না। হরিরামের স্ত্রী মারা গিয়েছে বছর কয়েক আগে। সংসারে একলা মানুষই এখন হরিরাম। খেতখামারের ওপর তার আর টান নেই, ধর্মকর্ম নিয়েই দিন কাটায়। বাড়িতে জোয়ান বয়েসের কাজের লোক আছে একটা. আর আছে পাঁড়েজী, বুড়ো বামুন।

কিকিরা দোতলার ঘরে ডেকে নিলেন চন্দনদের। ঘরটা কাঠের, শীতের রোদ খেয়ে মোটামুটি গরমই লাগছিল. সরাসরি রোদ পড়েছে পেছন দিকটায়, সামনে সরু বারান্দা।

কিকিরার ঘরে একটা তক্তপোশ, টিনের চেয়ার আর কাঁঠালকাঠের টেবিল ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। দড়ির আলনায় জামাটামা ঝুলছে কিকিরার।

চন্দনরা বসার পর কিকিরা তারাপদর মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "রাত্তিরে ঘুম হয়নি, স্যার?" বলে একটু হাসলেন।

চন্দন বলল. "ওর ঘুম তো গেছেই, সঙ্গে-সঙ্গে আমারও। কাল সারারাত তারা যা করেছে—ভাবছিলাম ওকেই একটা ইনজেকশান ঠুকে দিই।"

"কেন কেন?" কিকিরা কৌতূহল বোধ করে বললেন।

চন্দন বলল. "বলছি। তার আগে আর-একটা খবর আছে। সাধুমামার আজ শেষরাত থেকে শরীর খারাপ। বুকে ব্যথা। মৃত্যুঞ্জয় আমায় ডাকতে এসেছিল শেষ রাতে।"

কিকিরা কেমন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বুকে ব্যথা? কী হয়েছে?"

"আমার মনে হল, অনেকদিন ধরেই উনি কোনো দুঃখ-দুর্ভাবনার মধ্যে রয়েছেন, শরীরটাও দুর্বল। হার্টের কিছু গোলমাল হয়ে থাকতে পারে। আমার কাছে স্টেথসকোপও নেই। নাড়ি ধরে কতটুকু আর বুঝব! প্রেশার, হার্ট—সবই দেখানো দরকার। তবে এই ব্যথাটা বোধ হয় মনের ভীষণ দুর্ভাবনা থেকে হয়েছে।" বলে চন্দন অল্পের জন্যে চুপ করে তারাপদকে দেখল দু পলক, শেষে কিকিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যখন সাধুমামাকে দেখছিলাম, মৃত্যুঞ্জয় আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন নীচে এসে ইনজেকশান নিয়ে আবার ওপরে গেলাম তখন আমি মৃত্যুঞ্জয়কে ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম কায়দা করে।"

"কেমন করে?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"ব্যাপারটা সহজ। বললাম, আমার কাছে ইথার-টিথার নেই, ইনজেকশানের সিরিঞ্জ আর ছুঁচ স্টেরিলাইজ করতে হবে। গরম জলে এগুলো ফুটিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন তাড়াতাড়ি।"

কিকিরার মুখ দেখে মনে হল তিনি চন্দনের উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশী হয়েছেন।

চন্দন বলল, "সাধুমামার মুখ চোখ দেখে আমি আগেই বুঝেছিলাম তিনি আমায় কিছু বলতে চান। তাই কায়দা করে মৃত্যুঞ্জয়কে সরালাম। ঘরে যখন আমি আর সাধুমামা ছাড়া অন্য কেউ নেই—তখন সাধুমামা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটা চিরকুট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন. আপনার কাছে চিরকুটটা দিতে।" বলে চন্দন প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল।

তারাপদ বোকার মতন বসে থাকল। অবাক চোখ করে সে একবার চন্দনকে দেখছে. একবার কিকিরাকে। কী যে হয়ে যাচ্ছে—কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে সাধুমামা কিকিরাকে জানেন। এটাও জানেন যে কিকিরা এখন এখানে। তারাপদদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। সাধুমামাও যেন এক রহস্য।

কিকিরা চিরকুটটা নিয়ে পড়লেন। বার দুই। মনে হল, চঞ্চল হয়ে পড়েছেন; প্রকাশ করতে চাইলেন না। কী মনে করে একটা সিগারেট চাইলেন চন্দনের কাছে, তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে হঠাৎ উঠে গেলেন।

ঘরে তারাপদ আর চন্দন।

তারাপদ বলল. "কিসের চিরকুট?"

চন্দন বলল, "কিকিরা বলবেন।"

"তুই দেখিসনি?"

"দেখেছি। বুঝতে পারিনি।" চন্দন যেন কথাটা এড়িয়ে গেল।

তারাপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "সাধুমামা তোকে চিরকুট দিল কেন?"

চন্দন বলল, "তোকে দিয়ে লাভ হত না বলে। কিংবা তোকে দেবার কোনো সুযোগ ছিল না বলে।"

তারাপদর সন্দেহ হল। কিছু যেন ভাবল তারাপদ,

বলল. "তুই কী বলতে চাস—বুকের ব্যথার নাম করে সাধুমামা তোকে ডেকে ওই চিরকুটটা দিয়েছে?"

"আমার তাই মনে হয়." চন্দন ছোট করে জবাব দিল।

'সাধুমামাও তাহলে কিকিরাকে চেনে?' তারাপদ বলল।

চন্দন চুপ করে থাকল।

কিকিরা ফিরে এলেন। ফিরে এসে বসলেন না, ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করলেন, তারাপদকে দেখলেন বারবার। তারপর বললেন, "একটু দেহাতী চা খেয়ে নিন স্যার, তারপর কথা বলা যাবে।"

তারাপদর ধৈর্য থাকছিল না। সাধুমামা কেন চিরকুট পাঠিয়েছে কিকিরাকে? কী লিখেছে চিরকুটে? অসহিষ্ণু হয়ে তারাপদ বলল, "সাধুমামা আপনাকে কী লিখেছে?"

কিকিরা প্রথমটায় জবাব দিলেন না। পরে বললেন, "সবই বলব স্যার, রয়েসয়ে শুনতে হবে। তার আগে বলুন, ভুজঙ্গ কাল আপনাকে কোন্ খেলা দেখিয়েছে?"

তারাপদর রাগ হল। খেলা? কিকিরা সব জিনিসকেই খেলা মনে করেন? রাগ করে তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গ যা যা দেখায়, সবই আপনি খেলা মনে করেন?"

কিকিরা তারাপদর রাগ বুঝে যেন মনে-মনে হাসলেন। চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনিই বলুন, স্যার।"

সাধুমামার চিরকুটে কালকের কথার একটু-আধটু উল্লেখ ছিল। কিকিরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কাল ভুজঙ্গ কোন্ খেলা দেখিয়েছে। তবু, সবটাই শুনতে চান তিনি। কাল যা যা ঘটেছে চন্দন বলতে লাগল।

ওরই মধ্যে কাচের বড় বড় গ্লাসে চা এল। দেহাতী চা না দুধ-চা বলা মুশকিল, দুধে সাদা হয়ে রয়েছে, সর ভাসছে ওপরে।

চন্দন কথা শেষ করে থামল।

কিকিরা সব শুনে তারাপদর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি ঠিক জানেন আপনার বোনের আত্মা এসেছিল?"

তারাপদ জেদীর মতন বলল, "আসেনি তার প্রমাণ কোথায়?"

চন্দন চা খেতে খেতে বলল, "তারা, তোর মতন মুখ্যু আমি আর দেখিনি। তোকে আমি অত করে বোঝালাম—সাধারণ নিয়মে এটা হতে পারে না. অসম্ভব ব্যাপার।"

তারাপদ বলল, "জগতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। ভুজঙ্গ আমার পিসেমশাই হয়ে ডেকে পাঠাবে এটাই কি সম্ভব?"

চন্দন ভীষণ বিরক্ত বোধ করে চুপ করে গেল।

সামান্য চুপচাপ। কিকিরা বললেন. "তারাপদবাবু, আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন, আত্মা আছে, আর পরলোক থেকে সেই আত্মারা ভুজঙ্গর ডাকে মাটিতে নেমে আসে?"

তারাপদ একগুঁয়ের মতন বলল, "হ্যাঁ করি। আমি যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করব কেমন করে?"

কিকিরা কয়েক মুহূর্ত তারাপদর দিকে তাকিয়ে থেকে মজার গলায় বললেন, "আপনি যা যা দেখেছেন আমি যদি আপনাকে সেগুলো দেখাতে পারি তাহলে কি আপনি স্বীকার করবেন ভুজঙ্গ আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে?"

তারাপদ প্রথমে অবাক হল, তারপর অবিশ্বাসের চোখে কিকিরার দিকে তাকাল।

কিকিরা তাঁর আলখাল্লার মতন জামাটা খুলে ফেললেন। মাথার সেই টুপিটাও খুললেন। বড় রোগা দেখাচ্ছিল তাঁকে ; রোগা আর রুগ্ন। মাথার চুলও কিছু কিছু সাদা, লম্বা লম্বা চুল, ঘাড় পর্যন্ত নামানো।

কিকিরা বললেন, "চলুন আমরা নীচে যাই। নীচের তলায় হরিরামের একটা গুদোমঘর আছে। পুরোনো. পোড়ো ঘর। ঘরটা বেশ অন্ধকার। সেখানে আমরা এই সাত-সকালেই আত্মা নামাব।" বলে কিকিরা যেন হাসলেন, বললেন, "ভুজঙ্গর আত্মা-নামানোর ঘরে অনেক ব্যবস্থা আছে। সেটা স্যার মডার্ন। আমাদের পোড়ো গুদোমঘরে কিছু নেই। তবু দেখা যাক সেখানে আত্মা নামে কি না?"

তারাপদ এবার কেমন বিব্রত বোধ করল। ভুজঙ্গর আত্মা-নামানোর ব্যাপারটা পুরো ধোঁকা এ-কথা এখন প্রমাণ হয়ে গেলেও তার যেন ভাল লাগবে না। অথচ এটা যে মিথ্যে তাও জানা দরকার।

কিকিরা বললেন, "চলুন স্যার, দিনের বেলায় আত্মারা বড় একটা আসতে চায় না. তবু একবার চেষ্টা করা যাক। কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান অনেকদিন পরে তার খেলা দেখাবে।" বলে ঠাট্টার গলায় হাসলেন কিকিরা। তারপর জাদুকরের ভঙ্গিতে পিঠ নুইয়ে মাথা নিচু করে অভ্যর্থনার ভঙ্গি করে ডাকলেন তারাপদদের. "আসুন।"

চন্দন প্রথমে উঠে দাঁড়াল, তারপর তারাপদ। তারাপদ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় কিকিরা বললেন. "তারাপদবাবু, একটা কথা আপনাকে বলে দি। ভুজঙ্গ যতবড় শয়তান তার চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান। কিন্তু বুদ্ধিমানও ভুল করে। ভুজঙ্গ মস্তবড় ভুল করেছে। বারবার একই ফন্দি কাজে লাগে না। পরীর আত্মা নামিয়ে সে আপনার বাবাকে পাগল করেছিল। তাঁকে মেরেছিল বলা যায়। ওই একই কায়দা করে সে আপনাকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছে। কিন্তু ও জানে না—একই ফাঁদে দুবার শিকার ধরা যায় না।"

বাবার কথায় তারাপদ সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কিকিরা কিন্তু দাঁড়ালেন না। রোগা, রুগ্ন, হাড়-জিরজিরে মানুষটির মুখে ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা যেন জ্বলে উঠেছিল।

তারাপদ কিকিরার এমন মুখ কখনো দেখেনি। তার কেমন যেন ভয় হল।

কিকিরা নীচে নেমে গেলেন।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাদুকর বসন্তনিবাস

বসন্তনিবাস। কেউ বলে জাদুকর বসন্তনিবাস। বেশ লম্বামতো মানুষ। দেখতে ভারী সুন্দর। চুল কালো, কোঁকড়ানো। কখনও কখনও সে মাথায় পালক পরে থাকে। পালক পরলেই সে আর বসন্তনিবাস থাকে না। অন্য মানুষ হয়ে যায়।

সে কখনও পরে মখমলের পোশাক, কখনও তার পায়ে থাকে নাগরা জুতো। পোশাকে পৃথিবীর সব দেশের খেলনা সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। মাটিতে ছেড়ে দিলেই সেই খেলনাগুলো কেউ হরিণশিশু, কেউ প্রজাপতি, আবার কোনোটা কাকাতুয়া। বেশ তারা হেঁটে বেড়াতে পারে, উড়ে বেড়াতে পারে। কোনো কোনো দ্বীপের মানুষ বসন্তনিবাসকে এইভাবে দেখেছে।

কান দুটো তার ভারী অস্বাভাবিক। এক-একসময় এক-এক রকমের। রেগে গেলে কান খাড়া হয়ে যায়। খুশী থাকলে কান হাওয়ায় দোলে। যখন সে কোনো বন্দরে নেমে শিশুদের টফি দেয়, অথবা বাঘ হাতির খেলা দেখায়, কানে তখন তার অদ্ভুত একটা শব্দ। ফর্-ফর্-ফর্র্ শব্দটা ক্রমে যত লম্বা হতে থাকে, তত জমে ওঠে খেলা। সবাই বুঝতে পারে, আসলে বসন্তনিবাসের ভেতরে একটা বাঘ আছে। বাঘটা রেগে গেলে ডাকে। কানের ফোকরে তখন ফর্‌ফর্ শব্দ শোনা যায়।

এই খেলা নিয়ে সে একবার ভারী নাকাল করে ছেড়েছিল পাগো-পাগো দ্বীপের মহারাজকে।

আবার কেউ বলে, আসলে বসন্তনিবাস খেয়ালী মানুষ। সে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নানারকমের মজা করে সুখ পায়। জাহাজে কাজ করে-করে যখন কিছু ভাল লাগে না, বন্দরের জন্য মনটা ভীষণ আঁকুপাকু করে, তখনই নানারকমের বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। বন্দরে নেমেই সে কোনো পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই বন্ধুত্ব করতে চায়। ভিনদেশী মানুষ, কথা সে বোঝাতে পারে না। বোঝায় তার হাতের ইশারায়, অথবা জাদু বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ সে যা-যা জানে, তাই দিয়ে। যেমন সে ইচ্ছে করলেই পারে কান নাচাতে। নীচে ওপরে কাঁপছে কানটা তিরতির করে, ছোট্ট মেয়েটা অবাক হয়ে দেখছে, দেখতে দেখতে কাছে এসে যাচ্ছে, কাছে এলেই একটা ছোট্ট টফি। ছোট্ট মেয়েটা এ-ভাবে বসন্তনিবাসের বন্ধু হয়ে যায়।

এও শোনা যায়, সে নাকি পৃথিবীর সব বন্দরে সাদা জাহাজে ভেসে চলে যেতে পারে। তাকে সত্যি কেউ দেখেছে কিনা, না নানাভাবে সব বন্দরে আশ্চর্য সব গল্পের ভেতর বেঁচে আছে বসন্তনিবাস—সঠিক কেউ কিছু জানে না। অথচ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্বপ্নে দেখতে পায়, বসন্তনিবাসের জাহাজ এসে ভিড়েছে জেটিতে। বসন্তনিবাস দাঁড়িয়ে আছে বোট-ডেকে। পায়ের কাছে সাদা বড় একটা বাঘ। সে নামার সময় বাঘটাকে বেড়াল বানিয়ে নিয়েছে। সব ছেলেমেয়েকে কাছে ডেকে নানারকমের উপহার দিচ্ছে। যার যা চাই।

শহরের শিশুরা তখন আর ঘরে থাকতে পারে না। সবাই সমুদ্রের ধারে চলে আসে। বসন্তনিবাস সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে বলে। এবং এমন সব উপহার সবাইকে

দেয়, যা তারা মনে-মনে চেয়েছে। যেমন একটা মেয়ের ভারী দরকার স্লেট-পেনসিলের, সে সেটা পেয়ে গেল। পেনসিলের ক্ষয় নেই, স্লেট ভাঙবে না। যার দরকার ময়ূরের পালক, সে সহজেই নিয়ে গেল একটা পালক। যার স্বপ্ন দেখা দরকার, সে এক টুকরো স্বপ্নও নিয়ে গেল।

ছোট্ট মেয়েটি বলল, "আমাকে তুমি কী দেবে?" তখনই তার ঘুম ভেঙে গেল। সাদা জাহাজও নেই, বসন্তনিবাসও নেই। শুধু বাইরে তখন পাইনের বনে সে তুষারপাতের শব্দ শুনতে পায়। অথচ বিশ্বাস করতে পারে না স্বপ্ন। সত্যি সে যেন দেখতে পেল, বসন্তনিবাস তার কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে।

"এই, তুমি কী করছ জানালায়?

"তুমি কী করছ?"

"আমি ঘুমোচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ না, স্বপ্ন দেখছি তোমাকে।"

"তুমি ঘুমোচ্ছ কোথায়, তুমি তো জেগে আছ।" বসন্তনিবাস কেমন তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অথচ পাগো-পাগো দ্বীপের মানুষেরা জানে, সত্যি একবার বসন্তনিবাস এসেছিল। সে একটা ম্যাকাও গাছের নীচে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। পায়ের নীচে ছোট্ট একটা সাদা বেড়াল। মানুষেরা ঠিক বুঝতে পারেনি। বরং তার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল।

নামে-টামে মহারাজা, আসলে ব্যাটা ধুরন্ধর জলদস্যু প্যাগোর বংশধর। বাপ ঠাকুর্দার রক্ত গায়ে আছে, মাঝে-মাঝে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস। আর বড় বড় ঢেউ দেখলেই গুলিগোলা ছুঁড়ে বাপ-পিতামহের মহড়া চালিয়ে যাওয়া যেন, এসব সেরেই ফেরা হচ্ছিল, এবং ফিরেই সে অবাক, বন্দরে কেউ নেই। শুধু একটা লোক সামান্য দূরে বাগানে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। পায়ের কাছে ছোট্টমতো বেড়াল একটা।

একটা বড় রকমের কুচকাওয়াজ সেরে দেশে ফেরা, কোনো সাজসজ্জা নেই, লোকজন নেই, বিউগল বাজছে না। ব্যান্ড বাজছে না। দুটো-একটা ফাটা বেলুন মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে, কিছু দড়িদড়া, যেন কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে। সেনাপতি হুড্রো বলল, "হুজুর, কিছু বুঝতে পারছেন?"

"না।"

তখনই মিউ-মিউ গলায় কে যেন বলল, "হুজুর, জাহাজ থেকে নামবেন না। বাঘ।"

প্যাগোর বংশধর ড্যাগোর চোখ ছানাবড়া। "কে? কে মিউমিউ করে কথা বলছ?"

"হুজুর, আপনার ছোট মন্ত্রী, তালেব। বাঘ!" একটা গাছের ডালে তালেব উঠে বসে আছে। ভয়ে নীচে নামতে পারছে না।

লোকজন তখন জেটিতে নেমে যাচ্ছিল। ওরা বাঘ শুনে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু ড্যাগো খুব সাহসী মানুষের মতো সবাইকে বলল, "ডাবল মার্চ।" দৌড়ে কোনোরকমে প্রাসাদ বা আস্তানা যা-ই বলা যাক সেখানে পৌঁছালে, বড় মন্ত্রী হামজা বলল, "ফিরে এলেন হুজুর?"

তালেব ডাল থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে, এবং একেবারে ডাবলমার্চ করে আসায় খুব হাঁফাচ্ছিল। সে বলল, "আপনি হুজুর খুব বেঁচে গেছেন। ম্যাকাও গাছের নীচে একটা লোক শুয়ে আছে। আপনি আসবেন হুজুর, সবাই ফল-ইনে দাঁড়িয়ে আছি, ব্যাটার কী সাহস, গাছের নীচে ঘুমোচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে লাঠির খোঁচা মারলাম। ব্যাস যাবে কোথায়। হুজুর, সে এক কাণ্ড— লোকটা উঠেই তাকাল। খোঁচা খেয়ে রেগে গেছে হুজুর। কান দুটো সোজা হয়ে গেল। তারপর তিরতির করে কাঁপতে থাকল। তারপর না, হুজুর, সে এক বিষম কাণ্ড। যত কান তিরতির করে কাঁপে, তত কানে ফরফর শব্দ, তত দেখছি হুজুর সেই বেড়ালটা কেমন প্রথমে উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর, হুজুর, যত আড়মোড়া ভাঙে, তত লম্বা হয়ে যায়। হুজুর, বেড়াল বাঘ হয়ে যায়, এটা আজগুবি কথা না। সত্যি চোখে দেখা। কানের ফরফর ফ্যাটফ্যাট আওয়াজটার সঙ্গে বেড়ালের বাঘ হয়ে যাওয়ার কী একটা সম্পর্ক আছে হুজুর।"

"তবে ধরে এনে কান কেটে দাও। বেড়াল আর বাঘ হতে পারবে না।"

"কান কেটে দেব হুজুর?"

"কেটে দিতে ভয় লাগে, কান ধরে ওঠবোস করাও। কোন্ দেশের কী আদব-কায়দা, তা না জেনে আসা কেন?"

"তারপর হুজুর, তালেব চিৎকার করছে—বাঘ। আমরা আর থাকি কী করে! জান নিয়ে সবাই পালিয়েছি কোনোরকমে।" হামজা এবার ধপাস করে ড্যাগোর পায়ের কাছে বসে পড়ল।

"বাঘ না দেখেই দৌড়েছ?"

"সবাই যে বলল, সত্যি বাঘ।"

"বাঘ না হাতি! বোলাও সেই লোকটাকে। কান ফরফর করলেই হল। কান ধরে ওঠবোস করাও—সব জারিজুরি বন্ধ হয়ে যাবে।"

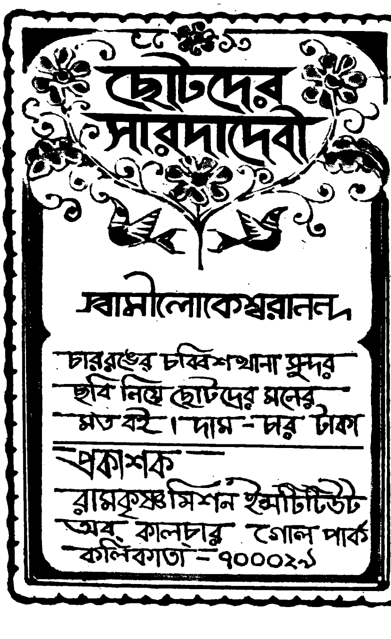

"কতবার হুজুর?"
"যতবার পারবে।"
"কোথায় ওঠবোস করাব?"
"কোথায় করাবে? তাইতো! ভাবতে দাও। কোথায় করানো চলে তালেব?"
"ভেবে দেখি হুজুর।"
বড়মন্ত্রী হামজা বলল, "খুব সমস্যা। খুব ভেবে দেখা দরকার।"
"তবে তোমরা ভাবো। চান-খাওয়াটা আমি সেরে নিচ্ছি।"
চান-খাওয়া সেরে ড্যাগো এসে দেখল, ওরা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। "কী, ভেবে কিছু ঠিক করলে?"
"কোথায় যে করি!" চিন্তায় তালেবের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। মাথা গরম হলেই টুপি তার মাথায় থাকে না। সে ভয়ে উড়তে আরম্ভ করে দেয়। টুপি ঘুরতে থাকে বনবন করে। ড্যাগো তালেবের অবস্থা টের পেয়ে বলল, "বাগানেই কর। লোকজন তবে সাক্ষী থাকবে। ভয়ে ওরাও কিছু অকম্ম করতে আর সাহস পাবে না।"
তালেবের সমস্যা মিটে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ভালমানুষের মতো মুখ করে টুপিটা মাথায় রাখল।
হামজা তখন বলল, "কিন্তু হু...জু...র।"
"আবার হুজুর!"

দরবারে লোক ঠাসাঠাসি। লোকটার বিচার হবে। সব দ্বীপবাসীরা খবর পেয়ে গেছে। ছেলে-বুড়ো-বৌ-ঝি সবাই চলেছে বাগানের দিকে। অনেকদিন পর আবার যাহোক সাজা দেবার মতো একটা লোক পাওয়া গেল।
আর তখনই দেউড়িতে চিৎকার, চেঁচামেচি। সেই ভিনদেশী লোকটা নিজেই হাজির। সঙ্গে সত্যি প্রকাণ্ড একটা বেড়ালের মতো বাঘ। আর কি কাছে থাকে কেউ। সব পালাচ্ছে। হামজা পথ না-পেয়ে সিংহাসনের মাথায় লাফ মেরে উঠে গেল। ড্যাগোর হাঁটু কাঁপছিল। আর তালেবের কী যে হবে! মাথা গরম হয়ে গেলে রক্ষে থাকে না। টুপি-ফুপি সব মাথা থেকে হাপিজ হয়ে যায়।
বসন্তনিবাস ঢুকেই কুর্নিশ জানাল। বলল, "হুজুরের তলব।"
শত হলেও মহারাজা মানুষ, দাঁড়িয়ে পায়ের কাঁপুনি দেখানো ঠিক না। সে ধপাস করে বসে পড়ল। বলল, "মশাইর থাকা হয় কোথায়?" একটা বেড়াল সঙ্গে। ড্যাগো বলল, "এটা আবার সঙ্গে কী?"
"এটা হুজুর টাইগার।"
"সে আবার কী!
"একটা মস্ত বনবেড়াল।"
"এটা তো মশাইয়ের দেশ না যে, যা-খুশি করে বেড়ানো চলবে।"
বসন্তনিবাসের কান অপমানে গরম হয়ে গেল। কান খাড়া হয়ে গেল।
ড্যাগোরও ইতিমধ্যে সাহস বেড়ে গেছে। বলল, "কী সাজা হবে, মশাইয়ের সেটা জানা থাকা ভাল।"
বসন্তনিবাসের কানদুটো পট করে ঝুলে পড়েই ফের সোজা দাঁড়িয়ে গেল।
তালেব চিৎকার করে উঠল, "হুজুর, খারাপ লক্ষণ, যা করার শিগগির করে ফেলুন। শত্রুপক্ষকে একদম সময় দিতে নেই।" সে দেখল, লোকটার কান যত লটপট করছে, তত বেড়ালটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে তালেবের মাথা ঠিক থাকছে না। গরম হয়ে যাচ্ছে। তাপে-ভাপে এবার টুপিটা ঠিক উড়তে শুরু করে দেবে।
তখন সবাই দেউড়িতে চিৎকার করছে, "শাস্তি, শাস্তি।"
গোলমালে কেউ টের পাচ্ছে না, বসন্তনিবাসের কান ফরফর করছে। পায়ের কাছে বেড়ালটা বুকডন দিচ্ছে, আসলে আড়মোড়া ভাঙছে। কবার করতেই লম্বা হয়ে গেল, ফুলে গেল শরীর। বাঘের মতো দেখাল সাদা বেড়ালটাকে। ঠিক একটা সাদা বাঘের মতো হাই করে উঠতেই, তালেবের টুপি মাথা থেকে বোঁ করে উড়ে গেল। ড্যাগো সত্যিকারের বাঘ দেখে তোতলাতে শুরু করেছে। বসন্তনিবাসের কানে যত ফরফর করে শব্দ হয়, তত যেন বাঘের তেজ বাড়ে। তালেবের টুপিটা তখন দরবারের ছাদে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে। ড্যাগো উপরের দিকে তাকাবে, না বাঘ দেখবে। তালেবের টুপির ভয় বাঘের ভয়ের চেয়ে কম নয়। সে চিৎকার করছিল, "ফায়ার।" টুপিটাকে, না-বাঘকে, না বসন্তনিবাসকে, বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপার দেখে সবাই পালাচ্ছে লাঠি বগলে করে। টুপিটা নেমে আসছে। তালেবের মন্ত্রঃপুত টুপি। অন্যের মাথায় বসলে আর উঠতে চায় না। গায়ের চামড়ার মতো সেঁটে থাকে।
ড্যাগো চিৎকার করে উঠল, "তালেব!"
তালেব বলল, "হুজুর, টুপি আর আমার বশ মানছে না।"
ততক্ষণে টুপি এসে বসে গেছে ঠিক ড্যাগোর মুখে। তালেব হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে। মস্ত জাদুকর তবে এই মানুষটা। এত বাধ্যের টুপি কথাবার্তা একদম শুনছে না।
টুপিটা তখন ড্যাগোর মুখে মুখোশের মতো সেঁটে যাচ্ছে। মুখটা আজগুবী মানুষের মতো দেখাচ্ছে। বাঘটা ঘাবড়ে গিয়ে দিচ্ছিল লাফ। বসন্তনিবাস তার পিঠে হাত রাখতেই বাঘ অমনি পোষা কুকুরের মতো ঠাণ্ডা।
বসন্তনিবাস বেশ মজা করে বলল, "আপনাকে হুজুর বেশ লাগছে দেখতে।"
তালেব আর হামজার চোখ গোল গোল হয়ে গেল। হুজুর টুপিটা মুখ থেকে টেনে তুলতে পারছে না। ছটফট করছে। দৌড়োচ্ছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এবারে মরে যাবে। পুরোপুরি টুপিটা চামড়ার মতো মুখে সেঁটে গেলেই শ্বাস বন্ধ হয়ে ফাঁসির আসামীর মতো মরে যাবে। ড্যাগো দুহাতে খামচে ধরেছে মুখটা। বসন্তনিবাস হা হা করে হাসছিল।
ড্যাগোকে আর মানুষই মনে হচ্ছে না। টুপিতে কোথাও সাদা রঙ, নীল রঙ। কোথাও টুপির বুকে টিউমারের মতো উঁচু উঁচু সব দাগ। সব মিলে একটা জোকারের মতো সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে ড্যাগো।
ড্যাগো মরে যাচ্ছিল। হায় হায় করছিল তালেব আর হামজা। বাঘটা করুণ চোখে দেখছে, শিশুর মতো আজগুবী মানুষটা হাত ছুঁড়ে দাপাচ্ছে। বসন্তনিবাস নুয়ে দেখছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছে, "বুঝতে পারছেন, কেউ আপনার বান্দা লোক না হুজুর।"
ড্যাগো ফ্যাসফ্যাস গলায় বলল, "বুঝতে পারছি।"
"সব পালিয়েছে।"
"তালেব, হামজা?"
"ঐ তো দৌড়ে পালাচ্ছে।"

"পালাচ্ছে!"

বসন্তনিবাস এবারে টুপিটা কলার খোসার মতো মুখ থেকে খসিয়ে নিল। বলল, "বিশ্বাস না হয় চোখ মেলে দেখুন।"

ড্যাগো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চোখ ঘোলা-ঘোলা। বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে বসন্তনিবাসের দিকে। চোখ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। দরবার ফাঁকা। কেউ নেই। কেবল সে আর বসন্তনিবাস। পায়ের কাছে একটা সাদা বেড়াল। লেজ নাড়ছে।

ড্যাগো এবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, "আপনি কোন দেশের কী দেবতা জানি না। অবোধ মানুষ আমি। বড় অপরাধ করে ফেলেছি।" বলেই পায়ের কাছে দুবার ওঠবোস করে ফেলল সে।

তারপর ড্যাগো দেখেছে কেমন সব অদৃশ্য। যেমন ছিল দ্বীপটা, তেমনি আছে। তারপর থেকে ড্যাগো, শোনা যায়, ভালোমানুষ হয়ে গেছিল। বসন্তনিবাস আর তার বাঘের স্ট্যাচু বানিয়ে রেখেছিল বন্দরের মুখে। আজকাল আর বাঘটাকে দেখা যায় না। শুধু বড় একটা ম্যাকাও গাছের নীচে জাদুকর বসন্তনিবাসের স্ট্যাচুটা দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে কত সব ফুল ফুটে থাকে। বিকেল হলে দ্বীপের সব শিশুরা বসন্তনিবাসের চারপাশে খেলা করে বেড়ায়। বন থেকে প্রজাপতিরা উড়ে আসে। সব শিশুর সঙ্গে, বসন্তনিবাসের সঙ্গে ওরাও উড়ে বেড়ায়। সামান্য দূরে সমুদ্র, অনন্ত নীল জলরাশি আর মাথার ওপরে তার অজস্র নক্ষত্র। কখনও বসন্তনিবাসকে অন্ধকার রাতে, অথবা জ্যোৎস্নারাতে ডেকে নিয়ে যায় সমুদ্র। সে তখন আবার সাদা জাহাজে ভেসে যায়। কেউ জানেই না, কেবল শিশুরা টের পায়, মূর্তিটার ভিতরে প্রাণ আছে। খুশিমতো সে যে-কোনো দেশে, যে-কোনো শহরে মানুষের দুঃখ টের পেলেই চলে যেতে পারে।

ছবি এঁকেছেন ॥ শৈবাল ঘোষ

তোমাদের কলকাতা

অনেক বাবাই এবার 'হাঁ' হয়ে গেছেন। 'হাঁ' হবারই কথা। কেন না এতদিন ধরে তাঁরা ছেলেদের বলতেন, ইস্, কলকাতা জাহান্নামে গেছে। বুঝলি, আমাদের সময় কলকাতা কি পরিষ্কার থাকতো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে! এখনকার মত ঘিঞ্জি নয়, রাস্তাঘাট চওড়া চওড়া, ট্রাম-বাসে একদম ভীড় নেই। কথাগুলি সত্যি। কিন্তু একথাও সত্যি যে এখনকার কয়েকটা জিনিস তোমাদের বাবারা চোখেও দেখেন নি। দেখছেন আর 'হাঁ' হয়ে যাচ্ছেন। কলকাতা বদলাচ্ছে—ভালর দিকেই যাচ্ছে অবশ্য। আরেকটু ভাল কি ক'রে করা যায় সে সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গেই একটু পরামর্শ করি।

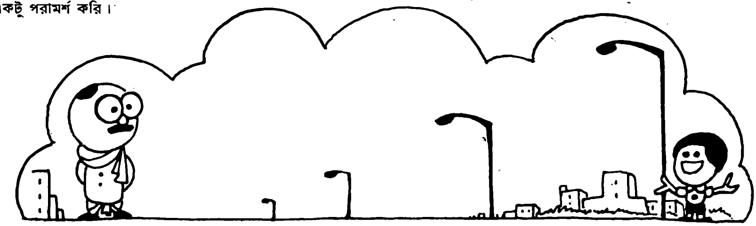

শুধু বাবারাই কেন, ঠাকুরদারাও শুনেছিলেন যে, বেহালায় ডায়মণ্ডহারবার রোড চওড়া হবে। কিন্তু সেটা মুখের কথাই থেকে গিয়েছিল এতদিন।

ভিড় বাড়ছে, সকাল-সন্ধ্যে ট্রাফিক জ্যাম। আর এখন? বেহালায় চৌরঙ্গীর মত রাস্তা হচ্ছে—সেই ডায়মণ্ডহারবার রোড চওড়া করে দিয়ে।

আরও শোনো। রাস্তার ওপর রাস্তা? সেও আবার সম্ভব নাকি? তোমাদের বাবারা ভাবতেও পারেন নি, কিন্তু তোমরা চোখের সামনে দেখবে আর কদিন পরেই ব্রাবোর্ণ রোড থেকে হাওড়া ব্রীজ পর্যন্ত ঠিক এমন একটা দোতলা রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে।

কোনদিন কেউ ভাবতে পেরেছিল কি যে, হাওড়া স্টেশন এলাকার নীচে এরকম একটা সুড়ঙ্গ পথ তৈরী হবে? লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চিন্তে দুবেলা রাস্তা পার হচ্ছেন, গাড়ি ঘোড়ার ঝামেলা বাঁচিয়ে। আর ওপর দিয়ে ট্রাম-বাস চলছে, মানুষের ভিড়কে বাঁচিয়ে। তোমাদের বাবারা কেবল বিলেতের গল্পই করতেন। এখন এই দেশেই, এই কলকাতা শহরে কত ভাল জিনিস তৈরী হচ্ছে। পাতাল রেল, দ্বিতীয় হুগলি সেতু···

তোমরা কি কেউ উল্টাডাঙ্গার দিকে থাকো? তাহলে নিশ্চয়ই জানো অরবিন্দ সেতুটি কতদিন ধরে তৈরীই হচ্ছিল, অথচ শেষ হচ্ছিল না। এখন শেষ হয়েছে। যাতায়াতের কত সুবিধা হয়ে গেছে।

শুধু ওখানেই কেন, চেতলার বাসিন্দারাও জানেন যতীন দাস সেতু তৈরী হওয়াতে যাওয়া আসার কত সুবিধা হয়ে গেছে। একটু লক্ষ করলেই দেখবে অরবিন্দ সেতু আর চেতলা সেতুর পাশেই সেই পুরনো কাঠের সেতু এখনও বিরাজমান। আগেকার আমলের সাক্ষী।

ওগুলো হচ্ছে মান্ধাতা আমলের। আর তোমাদের বাবারা যদি চটে না ওঠেন তাহলে বলতে পার তোমাদের বাবাদের আমলের।

কিন্তু তোমাদের আমলে? কলকাতা আর একটু ভাল হতে চলেছে, কারণ সি.এম.ডি.এ. বেশ কয়েকটা উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। কিন্তু কলকাতা উন্নয়ন কি কেবল রাস্তাঘাট, সেতু, আর জল সরবরাহের ব্যবস্থায়? ধর তোমরা একটা বাড়িতে আছ। বাড়িটা খুব ভাল। কিন্তু বাড়ির যত্ন না নিলে সেটা কদিন ভাল থাকবে? দুদিনে দেখবে ঘরের কোণায় ঝুল পড়েছে, নর্দমা বন্ধ হয়ে গেছে, পায়খানা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে। কলকাতাকে তোমার ঘর মনে কর, তোমার বাড়ি মনে কর। এটাকে পরিষ্কার রাখো, তাহলেই তোমাদের বাবাদের 'হাঁ' আরেকটু বড় হবে। তাঁরা স্বীকার করবেন যে তোমাদের কলকাতা তাঁদের কলকাতার চেয়ে অনেক ভাল।

কী করতে পার? যাঁদের বয়স হয়েছে তাঁদের অথবা মহিলাদের ভিড়ের ট্রামে-বাসে উঠতে বসতে এবং নামতে সাহায্য কর, বাড়ির জঞ্জাল যেখানে সেখানে যাতে না ফেলা হয় তার দিকে নজর দাও, বিশেষ করে যাতে এই জঞ্জাল নর্দমার ঝাঁঝরির ওপর না ফেলা হয়।

বাড়ির সামনে গাছ পুঁতে বা গাছ থাকলে একটু যত্ন কর। আরও কত কী করবার আছে, সব কথা কি বলে দেওয়া যায়? এই সব করলে দেখবে কলকাতার সুনাম কত ছড়িয়ে পড়েছে। আরেকটা কথা। এ বিষয়ে চিন্তা কর, তোমাদের যা ভাবনা, তোমাদের যা ইচ্ছে আর তোমাদের যা কর্তব্য বলে মনে হয় সে সম্বন্ধে সুন্দর একটা প্রবন্ধ লেখ।

কোথায় পাঠাবে? আগে যে সি. এম. ডি. এ'র কথা বলছিলাম তার চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেনের কাছে।
ঠিকানা? সি. এম. ডি. এ। কলকাতা-৭০০ ০১৭।
দেখ জবাব পাও কিনা। তোমাদের প্রবন্ধ ভাল লাগলে সেটা ছাপবার ব্যবস্থাও করা হবে।

সি. এম. ডি. এ. অনেক কিছুই করেছে, আরও করতে চায়। তোমরা যারা কলকাতায় থাক, যারা ভাবী নাগরিক তাদের ওপরইতো সব ভরসা। কেন না সি. এম. ডি. এ'র কাজের সুফল তোমাদের বাবারা যতখানি না ভোগ করবেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পাবে তোমরাই।

উপন্যাস

রাজা হওয়ার ঝকমারি

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে

বোম্বাগড়ের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। মরকত-মণিটিকে কেটে দু-ভাগ করা যায় না; তাই সেটিকে দেবেন এমন লোককে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ। আর শ্রেষ্ঠ নির্বোধকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, সেই রাজপুত্রই বসবে সিংহাসনে। রাজা বানপ্রস্থে গেলেন, মন্ত্রীমশাই শূন্য-সিংহাসনে রাজমুকুট বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, আর দুই রাজপুত্র বার হলেন নির্বোধ খুঁজতে। ছ মাসের মধ্যে বোকা খুঁজে বার করা চাই। কিন্তু সারা রাজ্য ঢুঁড়েও তেমন বোকা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বনবাসী মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী দুই রাজপুত্র দুই জাহাজে করে জম্বুদ্বীপে গেলেন। ছোট রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ ও তার ভৃত্য মধু সেখানে এক কলাওয়ালার দেখা পায়। বিনা-পয়সায় সে তার কলার কাঁদি বিলিয়ে দিতে চাইছে দেখে কান্তিনারায়ণ ভাবে, লোকটা ভারী বোকা। কিন্তু কলা নিয়ে তারা দু-চার পা এগোবার পরেই কলাওয়ালা কোতোয়ালকে বলে যে, তারা তার কলার কাঁদি চুরি করে পালাচ্ছে। বাস, কোতোয়ালও অমনি তাদের কয়েদখানায় পুরে দিল। ওদিকে, বড় রাজপুত্র কীর্তিনারায়ণও জম্বুদ্বীপে এসে বোকা খুঁজছিল। সেখানে, এক হাঁড়ি-কলসির দোকানের মালিক নিজেকে 'বোকা' বলে ঘোষণা করেছিল বটে. কিন্তু পরে দেখা গেল, সে অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। যে-হাঁড়ি সে বিক্রি করে, পরে লোক লাগিয়ে সেই হাঁড়ি ফাটিয়ে দেয়। সাক্ষীসাবুদ জুটিয়ে কীর্তিনারায়ণ তাই কোতোয়ালের কাছে চললো। কিন্তু সাক্ষীরাও সরে পড়ল, শান্ত্রীও দেখা গেল সুবিধের লোক নয়। গুপ্তচর অপবাদ দিয়ে কীর্তি ও তার ভৃত্যকে সে আটক করল। শূলে চড়াবার জন্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হল সেই হাজতখানায়, যেখানে কান্তিনারায়ণও বন্দী হয়ে আছে। কীর্তি তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার জন্য ঘুষ দিতে হবে। ঘুষের মোহর আনবার জন্যে কীর্তি একটা চিঠি লিখে হাজতের প্রহরীকে তার জাহাজে খাজাঞ্চীর কাছে পাঠাল। তারপর—

॥ দশ ॥

মন্ত্রী ভূপপ্রতাপ সিং ক'মাস ধরে বোম্বাগড়ে সাময়িকভাবে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বিশ্বস্ত লোকের হাতেই রাজ্যের ভার দিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। কোথাও কোনও গোলমাল হয়নি। রাজপুত্ররা যেদিন দু'জন বোকা লোক নিয়ে এসে বোম্বাগড়ে পৌঁছোবে সেইদিনই মহারাজাকে খবর দিয়ে রাজ্যে নিয়ে আসতে হবে। এখানে এসে তিনি যার আনা বোকাকে দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোকা বলে ঘোষণা করবেন, তাকেই মরকতমণিটা দান করে দেবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজপুত্রকে অভিষেক করে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দেবেন। তারপর আবার তিনি বনে চলে যাবেন। তখন মন্ত্রী ভূপপ্রতাপ সিংয়ের ছুটি। তখন আবার তিনি আগেকার মতন মন্ত্রী হয়ে রাজ্য-শাসনে রাজাকে সাহায্য করে যাবেন।

এইরকম ব্যবস্থাই আগে থেকে ঠিক হয়ে ছিল।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, মন্ত্রী-মশাইয়ের মনে ভাবনা হচ্ছিল। কই, এতদিন হয়ে গেল, এখনও তো রাজপুত্রদের কোনও খবর নেই। কোনও খবরও পাওয়া যাচ্ছিল না রাজপুত্রদের। অথচ এত সময় তো লাগবার কথা নয়। জম্বুদ্বীপ তো বোম্বাগড়ের মত ছোট দেশ নয়। সেখানকার লোকসংখ্যা বোম্বাগড়ের লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। সেখানে বোকা লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না তা হতে পারে না। তিনি জানতেন জম্বুদ্বীপে অনেক বোকা লোক আছে। তাদের মধ্যে দুজন বোকাকে খুঁজে আনতে রাজপুত্রদের এত সময় লাগছে কেন?

এক মাস গেল দু' মাস গেল। শেষকালে একে-একে চারমাস সময়ও পেরিয়ে গেল। তখনও রাজপুত্রদের দেখা নেই। কোনও খবরও নেই রাজপুত্রদের কাছ থেকে।

রাজপুত্রদের সঙ্গে তিনি অনেক টাকা অনেক মোহর পাঠিয়েছেন। তার সঙ্গে রাজ্যের ছোট কোষাধ্যক্ষকেও পাঠিয়েছেন। দরকার হলে যেন টাকার অভাবে রাজপুত্রদের কোনও কষ্ট না হয়।

ছোট কোষাধ্যক্ষ মশাই বৈজয়ন্ত সিং হিসেবী লোক। হিসেবী লোকও বটে, আবার বিশ্বাসীও বটে। তাকে বলা আছে রাজপুত্রদের যখনই কোনও টাকার দরকার হবে তিনি যেন তা দেবার ব্যবস্থা করেন।

তা শেষকালে যখন প্রায় পাঁচ মাস সময়ও পেরিয়ে গেল, তখন ভাবলেন আর দেরি করা উচিত নয়। আর তো হাতে সময় নেই তখন। তাঁর মনে ভয় হতে লাগলো নিশ্চয় কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে রাজপুত্রদের। তিনি ভাবলেন, আবার তিনি তাদের সন্ধানে আর-একটা জাহাজ পাঠাবেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই তাঁর বাঁ চোখের ওপরের পাতাটা নেচে উঠলো। বাঁ চোখের পাতা নাচা তো অমঙ্গলের চিহ্ন। তিনি রাজ-পুরোহিত দারুকেশ্বর পণ্ডিতকে খবর দিলেন।

পণ্ডিত মশাই আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "পুরোহিত মশাই, আজকে আমার বাঁ চোখের পাতাটা নাচছে কেন?

কোনও অমঙ্গলের চিহ্ন নয় তো?"

দারুকেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে সব সময় পঞ্জিকা থাকে। তিনি বললেন, "সকালবেলা বাঁ দিকের চোখের পাতা নাচা তো ভালো কথা নয়, পঞ্জিকা দেখতে হবে—"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "তাহলে দেখুন পঞ্জিকা। যাগ-যজ্ঞ যা করতে বলবেন তাই-ই না-হয় করবো। কী ব্যবস্থা করতে হবে বলে দিন—"

দারুকেশ্বর পণ্ডিত অনেকক্ষণ ধরে পঞ্জিকা দেখতে লাগলেন। রাজ-পুরোহিত মানুষ। বোম্বাগড়ের শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ সমস্তই পুরোহিত-মশাইয়ের নিজের দায়িত্ব। তাঁর বিচারে সামান্য ভুল থাকলে চলবে না। পঞ্জিকা দেখে বিচার করে বললেন, "আপনার বাম চক্ষুর পাতা নাচছে তো? তার ফলে অগ্নিভয় বোঝাচ্ছে—"

"অগ্নিভয়? তার মানে বোম্বাগড়ে আগুন লাগবে নাকি?"

"হ্যাঁ, এই যে এখানে লেখা রয়েছে—'বামদিকে অগ্নিভয় জানিবে নিশ্চয়'।"

অগ্নিভয়ের কথা শুনে ভূপ-প্রতাপ সিং আঁতকে উঠলেন। মহারাজা নেই, রাজপুত্ররা কেউ নেই, এই সময়ে কিনা অগ্নিকাণ্ড! তাতে যে তাঁরই বদনাম হবে। মহারাজা কী ভাববেন!

জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কী হবে পুরোহিত মশাই?"

দারুকেশ্বর পণ্ডিত বললেন, "তাহলে তার প্রতিকার করতে হবে।"

"প্রতিকার আছে?"

"তা আছে বৈকি শাস্ত্রে। এর প্রতিকার হচ্ছে—চিনি, দারুহরিদ্রা, ঘোড়া, পীতধান্য, পীতবস্ত্র, পুষ্পরাগমণি, লবণ, স্বর্ণ, সবস্ত্র ভোজ্য ও দক্ষিণার সঙ্গে মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণকে দান—"

প্রতিকারের তালিকা শুনে মন্ত্রীমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! ঠিক এই সময়ে কিনা এই বিপদ আসতে হয়? "মহারাজা যদি শোনেন এই এত খরচ হয়েছে তাহলে কী ভাববেন বলুন তো?"

দারুকেশ্বর পণ্ডিত বললেন, "তা যদি অত খরচ না করতে চান তো অন্য ব্যবস্থার কথা পঞ্জিকাতে লেখা আছে। বিকল্পে পঁচিশ কাহন কড়ি দিলেও চলবে। অবশ্য তাতে ফল তেমন হবে না।"

মন্ত্রীমশাই ভাবলেন তা কী করে হয়। তাঁর চোখের পাতা নাচার সঙ্গে সমস্ত বোম্বাগড় রাজ্যের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে। সুতরাং তাতে খরচ কমালে রাজ্যের প্রজাদেরই ক্ষতি।

বললেন, "কিন্তু তাতে রাজপুত্রদের কোনও ক্ষতি হবে না তো?"

পণ্ডিতমশাই বললেন, "তাও হতে পারে, কিছুই আশ্চর্য নয়।"

"তাহলে আর কোনও কথা নয়, আপনি আগে যা বললেন সেই ব্যবস্থাই করুন, খরচের কথা ভাবলে চলবে না। রাজ্যের মঙ্গলটাই বড় কথা..."

দারুকেশ্বর পণ্ডিত চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ খবর এল, ছোট কোষাধ্যক্ষ বৈজয়ন্ত সিং এসে গেছেন।

"কিন্তু রাজপুত্ররা?"

"তাঁরা আসেননি, শুধু ছোট কোষাধ্যক্ষ মশাই জাহাজ নিয়ে ফিরে এসেছেন।"

"কিন্তু বৈজয়ন্ত সিং তো বড় রাজকুমার কীর্তি-নারায়ণের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ছোট রাজকুমার কান্তিনারায়ণ, তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন বড় কোষাধ্যক্ষ সম্পূরণ সিং। তাঁদের কী হলো?"

বলতে বলতে রাজ-দরবারে এসে হাজির হলেন ছোট কোষাধ্যক্ষ বৈজয়ন্ত সিং। তিনি তখন হাঁফাচ্ছেন।

বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে মন্ত্রীমশাই, আমাদের বড় রাজকুমার জম্বুদ্বীপের হাজতখানায় বন্দী।"

"সে কী? কেন? কী অপরাধ করেছিলেন বড় রাজকুমার?"

ছোট কোষাধ্যক্ষ বললেন, "সে-সব কথা আমি কিছুই জানি না, এই দেখুন বড়-রাজকুমারের চিঠি। হাজতখানা থেকে বড়-রাজকুমার যে-চিঠি আমায় লিখেছেন, সেই চিঠি আমি সঙ্গে করে এনেছি, এই দেখুন—"

হ্যাঁ, ঠিক। বড়-রাজকুমার কীর্তিনারায়ণের নিজেরই হাতের লেখা। লিখেছে, "আমি এখন জম্বুদ্বীপের হাজতখানায় বন্দী। শুনিলাম ছোট-রাজকুমার কান্তি-নারায়ণও এই একই হাজতখানায় বন্দী আছে। আমাদের দুজনেরই একই অপরাধ—আমরা নাকি গুপ্তচর। যাহা হউক, এখন আমার দরকার পঁচিশটি মোহর। পঁচিশটি মোহর দিলে তবে ইহারা আমাকে ছোট-রাজকুমারের সহিত দেখা করিতে অনুমতি দিবে। সুতরাং এই পত্রবাহকের হাতে অতি অবশ্য পঁচিশটি মোহর পাঠাইয়া দিবেন। নতুবা আমাদের সমূহ বিপদ। ইতি—"

চিঠিটা পড়ে মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। "পঁচিশ মোহর ঘুষ দিতে হবে। মানে উৎকোচ! তবে ভাইকে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেবে? এ কী অরাজক অবস্থা! তবে কি জম্বুদ্বীপে এখন ঘুষের রাজত্ব চলছে?"

"তারপর? আপনি পঁচিশটি মোহর দিয়েছেন?"

বৈজয়ন্ত সিং বললেন, "না মন্ত্রীমশাই, আমি মোহর দিইনি। কী করবো বুঝতে পারিনি বলেই জাহাজ নিয়ে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে বোম্বাগড়ে চলে এসেছি। এখন আপনি যেমন বলবেন তেমনি করবো।"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "কিন্তু তারা যে গুপ্তচর তার প্রমাণ কী?"

"আজ্ঞে, ঘুষ দিলে তবে প্রমাণ হবে যে তাঁরা গুপ্তচর নন। জম্বুদ্বীপে ভীষণ ঘুষের প্রচলন রয়েছে। শুনলাম ঘুষ ছাড়া সে-দেশে কোনও কাজই চলে না। কেউ যদি সেখানে জমি কিনে বাড়ি করতে চায় তাতেও রাজার অনুমতি নিতে হয়। কোতোয়ালের সেখানে অবাধ ক্ষমতা। কোতোয়ালকে ঘুষ দিলেই সে-অনুমতি পাওয়া যায়। শুধু বাড়ি করা নয়, লোকে প্রচুর টাকা উপায় করে, কিন্তু কর দেয় না।"

"কেন? কর না দিয়ে কী করে রেহাই পায়?"

"রেহাই পায় ঘুষ দিয়ে। কোতোয়ালকে ঘুষ দিলে আর কোনও কর দেবার বালাই থাকে না। কিন্তু যারা সৎভাবে ব্যবসা-পত্তর করে তাদের ওপরে কোতোয়ালের খুব জুলুম। কোন ছুতো পেলেই তাদের শূলে চড়ানো হয়। তাই অসৎ লোকদেরই সেখানে পোয়া-বারো—"

মন্ত্রীমশাই শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। এমন দেশও আছে তাহলে পৃথিবীতে, যে-দেশে ঘুষ না দিলে কোনও কাজই করা যায় না?

"হ্যাঁ হুজুর, আমি তো তাই-ই শুনলুম। সেখানে

উঠতে বসতে ঘুষ। সেখানে যদি কেউ বাড়ি-ভাড়া নেয় তো আগে ঘুষ দিতে হবে, মানে সেলামি। কেউ যদি কারো নামে রাজ-দরবারে মামলা করতে যায় তো আগে পেশকারকে ঘুষ দিতে হবে, তবে তার আর্জি লেখা হবে খাতায়। কেউ যদি ছেলেকে পাঠশালায় ভরতি করতে চায়, তাতেও ঘুষ। কিম্বা কেউ যদি মারা যায় তো শ্মশানে তাকে পোড়াবার জন্যেও ঘুষ দিতে হবে, নইলে মড়া পড়ে থাকবে। কেউ ছোঁবে না। মানে জম্বুদ্বীপে খেতে-শুতে-বসতে ঘুষ। বেঁচে থাকতে চাইলেও ঘুষ, মরতে গেলেও ঘুষ। তবে সব ঘুষকে এক নামে ডাকা হয় না। কোথাও ঘুষের নাম বখশিস, কোথাও পান খাওয়া। এমনি হরেক রকম তার নাম। আমাদের এখানে যেমন শ্রীকৃষ্ণের শত নাম, জম্বুদ্বীপে তেমনি ঘুষেরও শত নাম—"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "কিন্তু জম্বুদ্বীপের রাজা? তিনি কী করতে আছেন? তিনি কিছু দেখেন না?"

বৈজয়ন্ত সিং বললেন, "তাঁকে তো চোখে দেখিনি। আমি জাহাজ থেকে কখনও ডাঙায় নামিইনি তো দেখবো কী করে? সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে আসে নৌকো করে তাদের কাছ থেকে শুনেছি জম্বুদ্বীপের রাজা নাকি দরবারে বসে সারা দিন-রাত দাবা খেলেন।"

"দাবা? দাবা খেলে? সে কী? রাজার কি কাজ-কর্ম নেই নাকি কিছু?"

"আছে। কিন্তু তিনি সমস্ত কাজকর্ম কোতোয়ালের ঘাড়ের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে নিজে দাবা খেলা নিয়ে মেতে থাকেন।"

মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "কার সঙ্গে দাবা খেলেন রাজামশাই?"

বৈজয়ন্ত সিং বললেন, "শুনেছি মন্ত্রীদের সঙ্গে।"

"তাহলে মন্ত্রীদের কাজ-কর্ম কারা দেখা-শোনা করে?"

"মন্ত্রীদের আবার কাজ কী? কাজ থাকলে তবে তো তা দেখা-শোনা করবে। রাজার সঙ্গে দাবা খেলাই তাদের কাজ। যা-কিছু করবার সমস্ত করে কোতোয়াল। কোতোয়াল মশাই-ই জম্বুদ্বীপের সর্বে-সর্বা।"

মন্ত্রী ভূপপ্রতাপ সিং কথাটা শুনে ভাবলেন তাহলে তো তাঁর বাঁ চোখের পাতা নাচার ফল হাতে-হাতে পাওয়া গেল। এ সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ কে জানে। এমন রাজ্য যখন পাশেই রয়েছে, তখন সৈন্য পাঠিয়ে এখনি জম্বুদ্বীপ জয় করে অধিকার করে নেওয়া যায়। তাহলে বোম্বাগড়ের সুখ-সমৃদ্ধি আরো অনেক বেড়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করলেন, "জম্বুদ্বীপে সৈন্য-সংখ্যা কত হবে বলতে পারেন ছোট কোষাধ্যক্ষ মশাই?"

"আজ্ঞে, তা বলতে পারি না। তবে শুনেছি সৈন্য-সামন্ত থাকলেও তারাও সবাই ঘুষখোর। ঘুষ খেয়ে খেয়ে তারা সব কুঁড়ে হয়ে গেছে। সবাই কেল্লায় বসে-বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।"

"আর তাদের অস্ত্র-শস্ত্র?"

"তাতে কি আর কেউ হাত দেয় হুজুর? সৈন্য-সামন্তরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আন্দাজ করা যায় অস্ত্র-শস্ত্রেও সব মরচে পড়ে গেছে। সব অস্ত্র-শস্ত্র অকেজো হয়ে পড়ে আছে।"

মন্ত্রীমশাই মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। এই সুযোগে যদি জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করা যায়, তাহলে তো বোম্বাগড়ের প্রজাদের সুখ-সৌভাগ্য বাড়বে। রাজকোষে আরো অনেক টাকা-মোহর আমদানি হবে। জম্বুদ্বীপ অবশ্য বন্ধুদেশ। জম্বুদ্বীপের রাজা দশবাহুবীরও বোম্বাগড়ের বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু যে-দেশের কোটালই সর্বে-সর্বা সেখানে কোনও ন্যায়-বিচার আশা করা অন্যায়। নইলে বিনা অপরাধে শুধু ঘুষ দিতে না-পারার জন্যে কিনা বোম্বাগড়ের মতন রাজ্যের দুজন রাজপুত্রকে গ্রেফতার করে হাজতখানায় পুরে রেখে দিয়েছে! না, ঘুষ তিনি দেবেন না। কিছুতেই তিনি এ অন্যায় বরদাস্ত করবেন না।

ছোট কোষাধ্যক্ষ বৈজয়ন্ত সিংকে বললেন, "ঠিক আছে, আমি সব শুনলুম, যা করবার আমি আপনাকে জানাবো। আপনি এখন গৃহে যান, এখন বিশ্রাম করুন গিয়ে, আমি দরকার হলে আপনাকে ডেকে পাঠাবো।"

"কিন্তু বড়-রাজকুমার আর কতদিন জম্বুদ্বীপের হাজতখানায় বন্দী থাকবেন। আর ছোট-রাজকুমারও তো সেই হাজতখানায় রয়েছেন। তাছাড়া কোষাধ্যক্ষ সম্পূরণ সিংমশাইও তো জাহাজে বসে সেখানে অপেক্ষা করছেন, তিনি হয়ত এ-সব খবর কিছুই জানেন না—"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "সে আমি বুঝবো, আপনি এখন আসুন।"

দারুকেশ্বর পণ্ডিত তখনও অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে মন্ত্রীমশাই, আপনার বাঁ চোখের পাতাটা কি এখনও নাচছে?"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "ও নাচুক, এখন বুঝতে পারছি কেন বাঁ চোখের পাতাটা নাচছে। এর প্রতিকার আমি নিজেই করবো, আপনি এখন আসুন।"

বলে নিজেই রাজ-দরবার ছেড়ে ভেতরের মন্ত্রণাকক্ষে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে সেনাপতিকে একবার তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে-সঙ্গে কোটাল নরহরি ভদ্রকেও একবার আসতে বললেন।

বোম্বাগড়ের সেনাপতি রণজিতেন্দ্র পাঠক পুরুষানুক্রমে সেনাপতি। বহুকাল ধরে সেনাপতিকে কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়নি। কিন্তু তবু সেনাপতির পদটাও রয়ে গেছে, সৈন্য-সামন্তও রয়ে গেছে। ওটা রাখতে হয় বলেই রাখা। প্রায় শোভার মত ব্যাপারটা। সৈন্য-সামন্তরা ডাল-রুটি খায়, লাঠি খেলে আর শরীরটাকে মজবুত রাখবার জন্যে কুস্তি করে। আর যদি কখনও দরকার হয় তো কুচ-কাওয়াজ করে। যেদিন বিশালাক্ষী দেবীর নামে বোম্বাগড়ে মেলা হয়, সেদিন ঘোড়সওয়াররা মহারাজার সামনে দিয়ে সার বেঁধে এগিয়ে চলে। পেছনে পেছনে যায় পদাতিকরা কাড়া-নাকাড়া বাজাতে বাজাতে। সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে দূর-দূর গ্রাম থেকে লোক আসে মেলায় আর রাজার মহিমা আর ক্ষমতা দেখে ভয়ে-ভক্তিতে মাথা হেট্ করে মহারাজাকে প্রণাম করে।

বরাবর এই-ই ছিল সেনাপতি রণজিতেন্দ্র পাঠকের কাজ। তিনি জানতেন যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁকে করতে হয়ওনি, আর করতে হবেও না কোনওদিন। সৈন্য-সামন্তরা, যারা রাজকোষ থেকে মাসকাবারি মাইনে পেত, তারা পুজো-পাঠ চাষ-আবাদ-গান-বাজনা নিয়েই থাকতো আর পড়ে পড়ে ঘুমোত।

তা সেদিন সেনাপতি রণজিতেন্দ্র পাঠক ভোরবেলা ঘুম থেকে যথানিয়মে উঠে গায়ে সরষের তেল ডলাই-মালাই করেছেন। সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন তাগড়াই চেহারার লোক তাঁর গায়ে কষে তেল-মালিশ করে দিয়েছে। তারপর নদীতে গিয়ে গলার পৈতেটা মেজে ঘষে পরিষ্কার করে স্নান করেছেন। আর তারপর বাড়িতে এসে দু' সের খাঁটি দুধ আর মোহনভোগ খেয়েছেন। খেয়ে সামনের বাগানে খাটিয়ার ওপর বসে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন। এমন সময়ে রাজ-দরবার থেকে ডাক এল। কী খবর? না মন্ত্রীমশাই জরুরী তলব দিয়েছেন। কথাটা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এমন ডাক তো পড়ে না কখনও তাঁর! রাজ-পুরোহিতের ডাক পড়ে, কোটালের ডাক পড়ে, পাত্র-মিত্রদের ডাক পড়ে। কিন্তু সেনাপতিকে কেন এমন সময়ে ডাকতে যাবেন মন্ত্রীমশাই?

যেতে একটু গড়িমসি করতে লাগলেন। কিন্তু তখনি আবার আর-একজন এসে গেল। বললে, "আপনার জন্যে মন্ত্রীমশাই অপেক্ষা করে রয়েছেন আর আপনি এত দেরি করছেন যেতে?"

তখন আর দেরি করলেন না সেনাপতিমশাই। সোজা রাজ-দরবারের দিকে রওনা দিলেন।

রাজ-দরবার নয়, একেবারে মন্ত্রণা-কক্ষ। সেখানে আর-কেউ নেই, শুধু কোটাল নরহরি ভদ্র আর মন্ত্রী ভূপপ্রতাপ সিং।

"কী খবর? আপনি এত দেরি করে এলেন যে? আমরা খুব ভাবছি। খুব জরুরী ব্যাপার।"

নরহরি ভদ্র সেনাপতির দিকে চাইলেন। সেনাপতি বললেন, "একটু রোদ পোয়াচ্ছিলাম, যা শীত পড়েছে।"

মন্ত্রীমশাইয়ের মুখ খুব গম্ভীর। বললেন, "আপনার রোদ পোয়ানোটাই এখন বড় হলো? আর আমার আজ সকাল থেকেই বাঁ চোখের পাতাটা যে নাচছে? আমি একলা মানুষ, ক'দিক সামলাবো—মহারাজা নেই বলে আপনারা একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছেন।"

"তাই নাকি? বাঁ চোখের পাতা? বাঁ চোখের পাতা নাচা ভালো কথা নয়। একদিন আমারও বাঁ চোখের পাতা ওইরকম নাচছিল, তারপর সেইদিনই ভাত খেতে বসে বলা-নেই কওয়া-নেই আমার একটা দাঁত পড়ে গেল।"

"আপনার দাঁত পড়ে গেল আর সেই সামান্য কারণেই আপনি কাবু হচ্ছেন? আর আমার যে এদিকে সব্বোনাশ, রাজকুমাররা জম্বুদ্বীপে গিয়ে হাজতখানায় বন্দী হয়ে আছেন, তা জানেন?"

"সে কী? তাহলে কী হবে?"

"কী আর হবে, তাদের ছাড়িয়ে আনতে হবে। যেমন করে হোক তাদের মুক্ত করে আনতে হবে। যদি তা না করতে পারি তো মহারাজা কী মনে করবেন ভাবুন তো? ভাববেন তিনি নেই বলে বোম্বাগড় রসাতলে গেল। বোম্বাগড়ের দুই রাজকুমার অন্য রাজ্যে বন্দী হয়ে রইল, এটা তো আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।"

"কিন্তু বন্দী হলেন কেন?"

"ওইতো ছোট কোষাধ্যক্ষ মশাই খবর এনেছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তারা নাকি গুপ্তচর। ওঁর কাছে পঁচিশ মোহর ঘুষ চায়। এখন এই অবস্থায় আমি স্থির করেছি আমি জম্বুদ্বীপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওই

দেশ অধিকার করবো।"

"যুদ্ধ করবেন?"

"হ্যাঁ, আপনি যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করুন। যা টাকা খরচ হবে, রাজকোষ থেকে সব টাকা দেওয়া হবে।"

"কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবো কি?"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "নিশ্চয় জয়লাভ করতে পারবো।"

"কিন্তু জম্বুদ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিরিশ লক্ষ, আর আমাদের সৈন্যসংখ্যা মাত্র তিনশো।"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "তা হোক, এই তিনশো সৈন্য দিয়েই আমরা ত্রিশ লক্ষ লোকের দেশ জয় করতে পারবো। জম্বুদ্বীপের রাজা দশবাহুবীর আমাদের বন্ধ ভাবাপন্ন হলেও তিনি দাবা খেলায় আসক্ত। দিন-রাত মন্ত্রীদের সঙ্গে কেবল দাবা খেলতে মত্ত। যে-রাজা দেশের ভালো-মন্দ চিন্তা না করে কেবল দাবা খেলা নিয়ে মেতে থাকেন তাঁর প্রজার সংখ্যা ত্রিশ লক্ষই হোক আর ত্রিশ কোটিই হোক, তাদের কোনও ক্ষমতা নেই। তাদের দেশ জয় করা কিছু কঠিন কাজ নয়, আপনি তৈরি হয়ে নিন।"

সেনাপতি রণজিতেন্দ্র পাঠক তবু দ্বিধা করতে লাগলেন। সারাজীবন আয়েস করে কাটিয়েছেন তিনি। কেবল রাজকোষ থেকে মাইনে নিয়েছেন আর ঘুমিয়েছেন। অস্ত্র-শস্ত্রগুলোয় শান দেওয়া হয়নি। কামান, বারুদ, তরোয়াল, ঢাল, গোলা-গুলি, সড়কি কিছুই ব্যবহার করা হয়নি বহুকাল। তারপর আছে ঘোড়া হাতি। তারাও লড়াই করতে ভুলে গেছে। যুদ্ধ-যাত্রা বললেই কি আর যুদ্ধ-যাত্রা করা যায়?

মন্ত্রীমশাই তাঁর দ্বিধা-সঙ্কোচ দেখে বললেন, "আর সেখানকার লোকরাও ঘুষখোর হয়ে উঠেছে। যে-দেশের রাজা দাবা খেলায় মত্ত আর যে-দেশের প্রজারা ঘুষখোর, সেখানকার লোকের আর আঘাত দেবার ক্ষমতা থাকে না। তারা মরেই আছে আগে থেকে। দেখবেন আমাদের সৈন্য-সামন্ত দেখলেই তারা ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে। আপনি কিছু ভাববেন না। সাত দিনের মধ্যেই জাহাজ নিয়ে যাত্রা করুন, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যেই।"

সেনাপতি রণজিতেন্দ্র পাঠক মশাই আর দাঁড়ালেন না। সেদিন কার মুখ দেখে ঘুম থেকে তিনি উঠেছিলেন কে জানে, কিন্তু যারই মুখ দেখে উঠে থাকুন, এমন বিপদে যে তাঁকে একদিন পড়তে হবে তা কি কখনও তিনি ভেবেছিলেন?

কোটাল নরহরি ভদ্র তখনও বসে ছিলেন। মন্ত্রীমশাই বললেন, "আপনি আর এখানে বসে আছেন কেন? আপনিও আপনার লোক-জন-সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে তৈরি হোন গিয়ে, আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে, যান।"

বলে মন্ত্রণা-কক্ষ থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সকালে বাঁ চোখের পাতাটা নাচার সময়ই তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, এমনি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু তা হোক বোম্বাগড়ের রাজ-সিংহাসনের সম্মান যদি বাঁচাতে হয় তাহলে জম্বুদ্বীপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে। এবং যত শীঘ্র যুদ্ধ-যাত্রা করেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল।

ভাবতে ভাবতে তিনি বিশালাক্ষী দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্যে তাঁর মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন।

জম্বুদ্বীপের বিশাল কারাগারের মধ্যে কীর্তিনারায়ণ আর দাশরথি তখন প্রতিমুহূর্তে মরণের প্রতীক্ষা করছেন। তখনও খাজাঞ্চী মশাইয়ের কাছ থেকে মোহর আসেনি। মোহর না পেলে কান্তিনারায়ণের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি মিলবে না।

সেদিন কারারক্ষী সেই লোকটা আবার এসে হাজির।

কীর্তিনারায়ণ মুখ তুলে চাইলে। জিজ্ঞেস করলে, "মোহর পাওয়া গেছে?"

লোকটা বললে, "না।"

কীর্তিনারায়ণ বললে, "না মানে? খাজাঞ্চীমশাই মোহর দেয়নি?"

লোকটা বললে "না, বলেছে তার কাছে মোহর মজুত নেই, বোম্বাগড় থেকে মোহর এনে দেবে। এখন তোমাদের খাজাঞ্চীমশাই জাহাজ নিয়ে বোম্বাগড়ে ফিরে গেছেন। যেতে আসতে আট-দশ দিন লাগবে। তারপর মোহর পাওয়া যাবে। আর যদি তিনি ফিরে না আসেন তো তোমাদের সকলকে শূলে চড়াবে।"

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

আমাজনের খুদে মানুষখেকো

অভ্র রায়

বাঘ-সিংহরা যে সময় সময় মানুষখেকো হয়ে যায়, সে-কথা তো সবাই জানে। কিন্তু মাছ? মাছেরা মানুষ দেখলেই ঝাঁক বেঁধে তেড়ে এসে খুবলে খুবলে তার মাংস ছিঁড়ে খায়, এমন সর্বনাশা কথা কেউ শুনেছো কখনো?

ব্যাপারটা শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক, পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি কিন্তু এমন বিচিত্র মাছও আছে। আমেরিকার আমাজন নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায় এই রাক্ষুসে মাছের দল। এদের নাম হল পিরান্‌হা।

ব্রাজিলের প্রায় প্রত্যেকটি নদীতেই কিলবিল করছে নানা জাতের এই পিরান্‌হা মাছ। গল্প শোনা যায়, হয়তো বেপরোয়া কোন লোক সাঁতার কাটবার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেখানকার জলে। ডাইভ দিয়ে জলের তলায় ডুবে গেল লোকটা। পাকা সাঁতারু সে, হয়তো ডুব-সাঁতার কেটে অনেক দূরে গিয়ে এক্ষুনি ভেসে উঠবে। পাড়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীসাথীরা সব অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোথায় কে? দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। আর ভেসে উঠল না লোকটা। অবশেষে সবাই বুঝতে পারল, নির্ঘাত সে পিরান্‌হাদের কবলে পড়েছে, এবং তাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কারণ ততক্ষণে মাংস বলতে হয়তো তার শরীরে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ওখানকার মানুষের মুখে পিরান্‌হাদের এমনি সব অনেক ভয়ংকর কীর্তিকলাপের কথা শোনা যায়। মাছগুলোর চেহারা দেখলে কিন্তু তাদের ততটা হিংস্র মনে হয় না। অনেকটা যেন খুব বড়ো চাঁদা বা পমফ্রেট মাছ। মুখটা আমাদের দেশের কাতলার মতো। নীচের চোয়ালটা যা একটু সামনের দিকে বাড়ানো। চোখ দুটো কিন্তু প্রকাণ্ড দুটো কাচের গুলির মতো। আর আছে খোঁচা-খোঁচা দু সারি ধারালো দাঁত। আবার একটা জাত আছে, অবিকল আমাদের দেশের কৈ মাছ। এরা কামড়ায় না বটে, কিন্তু এগুলোও কম শয়তান নয়। পিঠের ওপর, পাখনায় আর লেজে বড় বড় কাঁটা। ফুলিয়ে জলের নীচে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে এরা। অসাবধান হয়েছো কি কাঁটা বিঁধিয়ে একেবারে ফালা-ফালা করে দেবে। তখন সেই ঘা সারিয়ে তুলতে প্রায় দু-তিন মাসের ধাক্কা।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, সব সুদ্ধ মোট ষোল জাতের পিরান্‌হা আছে। এদের সবাই কিন্তু মানুষখেকো নয়। মাত্র চারটি জাত হল ভীষণ হিংস্র। স্থানীয় লোকেরা এঁদের চেনে, তাই মানুষখেকোদের আস্তাগুলো যতটা সম্ভব এড়িয়ে থাকে। পরিষ্কার জলের মধ্যে পিরান্‌হারা যখন দল বেঁধে খেলে বেড়ায় তখন দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগে। লাল, নীল, সোনালী কত বিচিত্র রঙ আর কত অদ্ভুত আকৃতি তাদের। নানা জাতের দুর্লভ মাছ সংগ্রহ করা যাঁদের শখ, তাঁরা কিন্তু মোটেই ভয় পান না এদের। বরং অ্যাকুয়ারিয়ামে পুষবার জন্যে দু-একটা ধরে নিয়ে যান সঙ্গে করে। কিন্তু এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াও কি কম ঝকমারি নাকি!

একবার লন্ডন থেকে এক ভদ্রলোক বেড়াতে এসে তাঁর অ্যাকুয়ারিয়ামের জন্যে অনেকগুলো মাছ ধরেছিলেন। তার মধ্যে একটা মানুষখেকো পিরান্‌হাও ছিল। জলভরা পলিথিনের ব্যাগে তিনি মাছগুলোকে সাজিয়ে রাখলেন। যাবার সময় প্লেনে করে নিয়ে যাবেন। মানুষখেকো পিরান্‌হাটার জন্যে দু পাল্লা মজবুত পলিথিনের ব্যাগ আর তার চারদিকে শক্ত কার্ডবোর্ডের বাক্স। ভদ্রলোক প্লেনে উঠতে যাবেন, এমন সময় লক্ষ করলেন, সেই বাক্সটা থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। কী ব্যাপার? খুলে দেখেন, সেই রাক্ষুসে মাছটা দাঁত দিয়ে দুটো ব্যাগই কামড়ে ফুটো করে দিয়েছে। ভদ্রলোক ছিলেন একজন নামকরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তিনিও মনে মনে বললেন: দাঁড়াও এবার দেখাচ্ছি মজা।

কী করলেন তখন তিনি জানো?

মাছটাকে আবার নতুন থলিতে পুরে জলের মধ্যে এবার দ্বিগুণ পরিমাণে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলেন। প্রথমবারও ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন, কিন্তু পিরান্‌হাটা তা বেমালুম হজম করে ফেলেছিল। এবার বাছাধন কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ভদ্রলোক নির্ভয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশের দিকে উড়ে চললেন।

তিনকড়ি

বুদ্ধদেব গুহ

পর পর পাঁচ ভাই মারা যাওয়ার পর যখন কড়িদা জন্মাল, তখন কড়িদার মা তাঁর নাম রাখলেন তিনকড়ি। ঠিক যে নাম রাখলেন তা নয়, তিন কড়ি দিয়ে কড়িদার কাকিমা কিনে নিলেন তাকে তার মার কাছ থেকে।

সকলেরই ভয় ছিল যে, কড়িদাও বুঝি বাঁচবে না। কিন্তু কড়িদা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।

কড়িদাকে আমি প্রথম দেখি যখন আমি কলেজে ঢুকেছি তখন। আমার পিসীমার বাড়ি ছিল আসামের ধুবড়ি শহর থেকে কচুগাঁওয়ের দিকে যাবার রাস্তায় তামাহাট বলে ছোট একটা গঞ্জে। কড়িদারা থাকত তামাহাটের আগে কুমারগঞ্জ বলে আরেকটা গ্রামে।

কড়িদা যখন ছোট তখনই কড়িদার বাবা মারা যান। বিধবা মা তাঁর অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সিন্দুকের যৎসামান্য পুঁজি দিয়ে কড়িদাকে মানুষ করেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের ছেলেকে নিজের ছেলে মনে করার মত সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। পারেননি এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর অন্য পাঁচ ছেলের মতই কড়িদাও পালিয়ে যায়।

পিসীমা ও পিসেমশাই কড়িদাকে নিজেদের ছেলেদের সঙ্গে একইরকম করে বড় করতে থাকেন। এখানে-ওখানে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত কড়িদা আমার অন্য-দুই প্রায়-সমবয়সী পিসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাই কলকাতায় থাকতাম বলে তাদের কারো সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হত না।

কলেজের গরমের ছুটিতে ধুবড়ি গেলাম। রাত কাটালাম কড়িদার কাকা পূর্ণকাকার বাড়িতে। আজকে আমার পিসেমশাই, পূর্ণকাকা কেউই আর বেঁচে নেই।

বাড়িতে বিজলীর আলো ছিল না। পাখাও ছিল না। সে রাতে বড় ভ্যাপসা গুমোট গরম ছিল। ব্রহ্মপুত্রর দিক থেকে হাওয়াও আসছিল না একটুও। এদিকে প্রচন্ড মশা। বাধ্য হয়ে মশারি টানিয়ে শুতে হয়েছিল। কড়িদার খুড়তুতো দিদি ভারতীদি যত্ন করে মশারি টানিয়ে দিয়ে গেছিলেন। কড়িদা আর আমি পাশাপাশি খাটে শুয়েছিলাম। আমাকে জানালার পাশের খাটে যেখানে হাওয়া-লাগার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে শুতে দিয়েছিল কড়িদা।

আমি আজন্ম কলকাতায় মানুষ, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় অভ্যস্ত; সাহেবী কলেজে পড়ি, সমস্ত মিলিয়ে সেই পাখাহীন ঘরে, মশারির দুর্গের মধ্যে বন্দী হয়ে একজন গ্রাম্য ছেলের পাশে শুয়ে, যাকে আমি সেদিনই প্রথম দেখলাম বলতে গেলে, আমার ভারী অস্বস্তি লাগছিল। কড়িদার সঙ্গে গল্প যে কী করব তার বিষয়ও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কলকাতার সেই-আমির সঙ্গে ছোট-ছোট অনগ্রসর জায়গায় স্কুলের হস্টেলে-মানুষ গেঁয়ো ছেলেটির সঙ্গে ভাব হচ্ছিল না।

কড়িদা তখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে দু-একটা কথা বলেছিল মাত্র। তবে সেই মুখের দিকে প্রথমবার

চেয়েই আমার মনে হয়েছিল যে, এমন নিষ্পাপ, স্বর্গীয় মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।

রাত গভীর হচ্ছিল। মশারির মধ্যে গরম এবং বাইরে মশার পিন্‌পিনানি বেড়েই চলছিল। ঘরের পাশে একটা কী-যেন ফুলের ঝোপ ছিল। সেই ঝোপ থেকে ঝিম-ধরা গরমের মত একটা ঝিম-ধরা গন্ধের ঝাঁঝ উঠছিল।

আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিন্তু কড়িদার যে কেন ঘুম আসছিল না, তা বুঝতে পারছিলাম না। এটাই তার ঘর, এই ঘরেই সে রোজ শোয়, বৈদ্যুতিক পাখাতে সে অভ্যস্তও নয়। তাহলে?

ছটফট করতে করতে বোধহয় চোখ জুড়ে এসেছিল এক সময়, চোখ জুড়ে আসার পরই বেশ একটা হালকা হাওয়া আসতে লাগল মাথার দিক থেকে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ভাবলাম, বোধহয় নদীর দিক থেকে হাওয়া দিল।

পাশের বাড়ির কতগুলো রাজহাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক আওয়াজে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে দেখি কড়িদা খাটের মাথার দিকে একটা চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। অসহায় ভঙ্গিমায় তার শরীরটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে হাত-পাখাটা মাটিতে পড়ে আছে।

কড়িদা কখন ঘুমিয়েছে জানি না। হয়ত একটু আগেই। মশার কামড়ে হাত দুটো লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে গেছে। কিন্তু মুখে সেই অম্লান অনুযোগহীন অভিযোগহীন হাসি।

এই কড়িদা!

যাকে সে জানে না ভাল করে, চেনে না, যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই, বন্ধুত্ব নেই, যার সঙ্গে নেই কোনো দেনা-পাওনার সম্পর্ক, সেই কলকাতার ছেলেটাকে নিজে সারারাত মশার কামড় খেয়ে হাতপাখা চালিয়ে ঘুম পাড়ানোর অযাচিত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ভার একমাত্র কড়িদাই নিতে পারত।

সকলের প্রতিই ঠিক একই রকম ব্যবহার ছিল তার।

তামাহাটে পৌঁছে খুব মজা করতাম আমরা। পূর্ণকাকুর দোনলা বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে-বনে ঘুরে বেড়াতাম।

সাত-বোশেখীর মেলা বসেছিল রাঙামাটি পাহাড়ে। টুঙ-বাগানের ছায়া-শীতল ভয়-ভয়, সাপ-সাপ, বাঘ-বাঘ গন্ধ ভরা বুনো পথ মাড়িয়ে রাঙামাটি-পর্বতজুয়ারের জঙ্গল। ম্যাচ-সর্দারদের বাসা সেখানে। সারা দুপুরে নিকোনো-দাওয়ায় বসে তেলচুকচুক সটান চুলে কাঠের কাঁকই গুঁজে, তাঁত বোনে যেখানে ম্যাচ মেয়েরা। আর হলুদ-লাল কাঁঠাল পাতা ঝরে পাহাড়ী হাওয়ায় টুপ-টাপ, খুস্‌স্‌-খাস করে। সেখানে নিয়ে গেল কড়িদা আমায়। ম্যাচ সর্দার লম্বা বিড়ি মুখে দিয়ে বাইরে বসে দা দিয়ে একটা কাঠ কেটে কেটে কী যেন বানাচ্ছিল।

কড়িদা বলল, "আছে কেমন?"

বুড়ো সর্দার ঘোলাটে চোখ তুলে বলল, "ভাল আছি।"

কড়িদা হাসল, বলল, "তুমি তো ভাল থাকবেই। সে আছে কেমন?"

সর্দার এবার অবাক হল।

বড় বড় বিস্মিত চোখ তুলে, নিজের বাতেধরা শরীরটাকে কোনোক্রমে ওঠাল, হাড়ে হাড়ে কটাকট শব্দ তুলে, তারপর দাওয়ার এক কোনায় একটা বাঁশের চালায় নিয়ে গেল আমাদের।

দেখি, একটা বাদামী রঙা ভুটিয়া কুকুর খড়ের উপর শুয়ে আছে। তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি দগদগে ঘা। কী-সব পাতা-টাতা বেটে লাগানো আছে তাতে। ঘরময় ঘিন্‌ঘিন্‌ করে মাছি উড়ছে।

কড়িদা বিড়বিড় করে বলল, "নাঃ, অবস্থা ভাল নয়। ধুবড়ি গিয়ে ওষুধ আনতে হবে।"

আমি শুধোলাম, "কী হয়েছিল?"

কড়িদা বলল, "সাতদিন আগে ওকে একটা ছোট চিতা কামড়ে দিয়েছিল।"

"তুমি জানলে কী করে?"

"এই সর্দার হাটে এসেছিল পরশুদিন, ওর মুখে শুনেছিলাম।"

"কুকুরটা বুঝি তোমার খুব প্রিয়?"

কড়িদা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী ভাবল অল্পক্ষণ।

তারপর হেসে বলল, "হ্যাঁ! খুব প্রিয়।"

"কী নাম কুকুরটার?"

কড়িদা বলল, "জানি না তো।"

সর্দার বলল, "ডালু।"

তারপর সর্দারই বলল, "দিনদশ হল আমার বেয়াই কচুগাঁও থেকে আমার জন্যে জামাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"আমি আরো অবাক হলাম সে-কথা শুনে।

কড়িদা বলল, "কুকুরটাকে আগে দেখিনি। তবে বেচারীকে চিতাবাঘে কামড়েছে শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া বুড়োর মুখ দেখে মনে হয়েছিল কুকুরটাকে বুড়ো বড় ভালবেসে ফেলেছে। আর বুড়োর খুব ভাল লাগবে যদি আসি, তাই তোমাকে নিয়ে চলে এলাম।"

আমি বললাম, "এই জন্যে, সাইকেলে ও হেঁটে বারো মাইল এলে তুমি? মিছিমিছি? বুড়ো কি তোমাদের পাটের ব্যবসায় সাহায্য করে?"

কড়িদা আবার অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল আমার দিকে। বলল, "না তো! বুড়োর সঙ্গে হাটে দেখা হয় মাঝে মাঝে।"

কড়িদা পকেট থেকে পটাশ-পারমাঙ্গানেটের লাল লাল কুচি বের করল, কাগজে মোড়া। বুড়োকে বলল, "গরম জলে এই ওষুধ একটু গুলে ঘা-টাকে ভাল করে ধোবে বার বার। কাল আমি আবার আসব ওষুধ নিয়ে।"

পর্বতজুয়ার থেকে অনেকখানি হেঁটে এসে তারপর সাইকেলে ফিরছিলাম আমরা। মাইল তিনেক রাস্তা চষা-ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হয়। পেছনের হাড়-গোড় প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল আমার।

রেগেমেগে কড়িদাকে বললাম, "কোনো মানে হয় একজন অচেনা-অজানা লোকের জন্যে আর তার কুকুরের জন্যে এই হয়রানির?"

কড়িদা হাসল সাইকেল চালাতে চালাতে।

বলল, "একটু জিরিয়ে নাও। এসো ওই বড় গাছটার নীচে বসি একটুক্ষণ।"

সাইকেল দুটো গাছে ঠেস-দিয়ে রেখে আমরা মুখোমুখি বসলাম। পশ্চিমের আকাশে সবে সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ভারী একটা শান্তি চারিদিকে। সন্ধে হবার ঠিক আগে নিরিবিলি জায়গায় থাকলে বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে ওঠে।

কড়িদা বলল, "তুমি বোধহয় লক্ষ করোনি ম্যাচ-সর্দার যখন হাসল, তখন তার মুখটা কেমন দেখাচ্ছিল। তুমি

কি কুকুরটার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে? তাকাওনি তো? তোমার দোষ নেই। কেউই তাকায় না। কিন্তু তাকালে বুঝতে পারতে, কুকুরটাও কত খুশী হয়েছিল আমাদের দেখে।"

তারপর হঠাৎ বলল, আবারও হাসতে হাসতে, "জানি, তোমার খুব কষ্ট হল। ঠিক আছে। কাল আমি একাই আসব। ওষুধ আনতে হবে সকালে গিয়ে। ঘায়ের অবস্থা ভাল না কুকুরটার।"

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, "কলকাতার পথে-ঘাটে এমন কত কুকুর তো রোজ মরে। বড়লোকদের শৌখিন কুকুর ছাড়া, কুকুরের চিকিৎসার কথা তো কখনও শুনিনি। কুকুরটা মরে গেলে তোমার কী যাবে-আসবে?"

কাঁড়িদার মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপরেই আবার সেই আশ্চর্য, উদার অনাবিল হাসিতে ভরে গেল। ডান হাতে এক মুঠো দূর্বাঘাস ছিঁড়ে বলল, "দ্যাখো, কেউ মরে গেলে কারও কিছু এসে যায় না। আমাদের মত সাধারণ লোক, কুকুর-মেকুর এইই সব। কিন্তু..."

কিন্তু বলেই কাঁড়িদা থেমে গেল।

আর কিছুই বলল না।

একটু থেমে বলল, "তোমার মত ভাষা আমার নেই, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু অন্য কাউকে খুশী দেখলে, সুখী দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। কী যে ভাল লাগে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সে যেইই হোক না কেন। আর, কাউকে দুঃখী দেখলে আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়। আমি গেঁয়ো মানুষ; আমি অমনিই। আমাকে কেউ বোঝে না।

এরপর কাঁড়িদা কর্মজীবনে কলকাতায় এসেছিল। আমার চেয়ে বয়সে দু বছরের মাত্র বড় ছিল। সেই গেঁয়ো লোকটা শহরে এসেও একটুও বদলাল না। কলকাতার

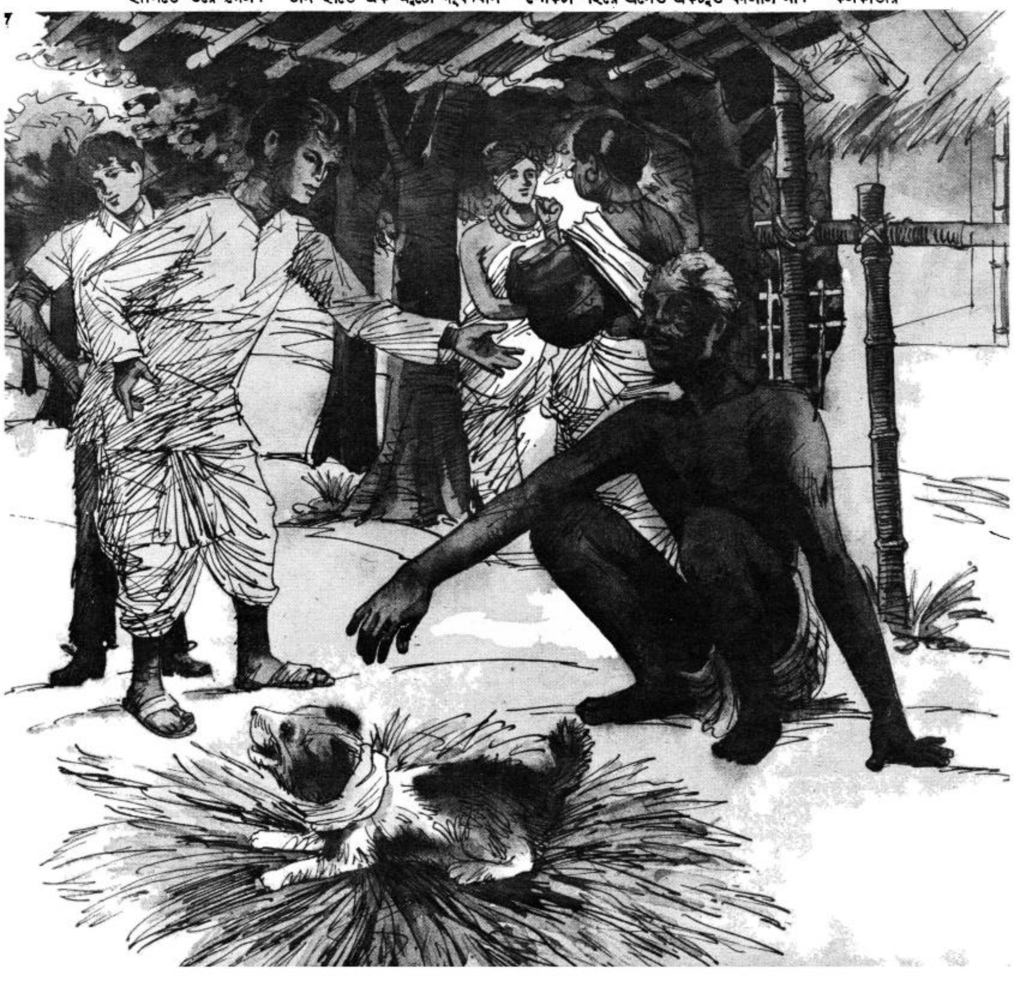

কেজো জগতের সমস্ত স্বার্থপর লোকই তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিল। যার যা অসুবিধা, ডাকো কড়িকে। ডাক না-পাঠালেই বা কী, অসুবিধার কথা জানতে পারলেই হল, কড়িদা ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছত। নিজের কাজকর্ম করে এবং রীতিমত ক্লান্ত থাকার পরেও যে কড়িদা কী করে এত লোকের জন্যে এত কিছু করত তা ভাবলেও অবাক লাগে।

কেউ যদি কখনও কড়িদার ছোট্ট বাড়িতে গিয়ে পৌঁছত তাহলে তাঁর যে কী আনন্দ হত তা তার মুখের হাসি যে না দেখেছে, সে বুঝবে না।

কড়িদা বলত, "বুঝলে, আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক, আমাদের উপর কোনো দায়-টায় নেই, কোনো বড় কাজ আমাদের দ্বারা হবে না, আমরা মরে গেলে কারও কিছু যাবে আসবে না, ময়দানে স্ট্যাচু বানাবে না কেউ, এই রকম হেসে-খেলে বেঁচে থাকলেই খুশী।"

হেসে-খেলেই থাকত কড়িদা। তার নিজের যে কোনো-রকম অসুবিধা ছিল, দুঃখ ছিল মানসিক, কষ্ট ছিল শারীরিক, তা কেউ কখনও জানতে পারেনি। সমস্তক্ষণ সে অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্যেই এমন ব্যস্ত থাকত যে, নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ পায়নি কখনও। অন্যের জন্যে, অন্যের কারণে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ সে পেয়েছিল, আর সেই সুখেই বুঁদ হয়ে ছিল।

শুনলাম কড়িদার পেটে ব্যথা হয়। শরীরে কী সব গোলমাল। চেহারা ও হাসি দেখে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। কারও।

হঠাৎ শুনলাম কড়িদা হাসপাতালে ভর্তি হবে। কী সব পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে — সিসটোগ্রাফ — বায়োপসি ইত্যাদি। বায়োপসি করে ধরা পড়ল ক্যানসার।

যেদিন অপারেশন, তার আগের দিন নার্সিং হোমে দেখতে গেলাম। বৌদি কোমর টিপে দিচ্ছিলেন।

আমি যেতেই কড়িদা উঠে বসল, জমিয়ে গল্প জুড়ে দিল, যেন ওটাও তার বাড়ির বৈঠকখানা। চমৎকার দেখাচ্ছিল কড়িদাকে। ধুতি আর পাতলা লংক্লথের পাঞ্জাবীতে।

আমি যখন উঠলাম, বলল, "শরীরের যত্ন নিও, তুমি বড় বেশী খাটো অত্যাচার করো বড়।"

পরদিন অপারেশন হল। আর জ্ঞান ফিরল না। কড়িদা হাসতে হাসতেই বলতে গেলে, অত বড় দুরারোগ্য রোগটাকে হারিয়ে দিয়ে, আমাদের মত খাটো মাপের সব মানুষদের মাথা ছাড়িয়ে তার যেখানে জায়গা সেখানে চলে গেল।

প্রায়ই মনে পড়ে, এবং চিরদিন পড়বে যে, কড়িদা একদিন সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী রেখে বলেছিল, "কেউ মরে গেলে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু..."

আজ আমি জানি, তুমি সেদিন ঠিক বলোনি কড়িদা। কেউ কেউ মরে গেলে কারো কারো যায়-আসে নিশ্চয়ই; বড় বেশী যায় আসে।

কড়িদার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমার পিসীমা বড় শস্তা দামে কড়িদাকে কিনেছিলেন। মাত্র তিনটি কড়ি দিয়ে।

কিন্তু পৃথিবীর সব কড়ি দিয়েও কি তোমার দাম দেওয়া যেত কড়িদা?

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক/শুভঙ্কর

এবার বরং একটি গল্প শোনাই। এক ভাগ্যহত ছেলের গল্প। কোনো স্কুলে লেখাপড়া শেখেনি ছেলেটি। খুব ছেলেবেলায় পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল, তখন সে শিখেছিল যোগ করতে। আর অল্পস্বল্প বিয়োগ-গুণ-ভাগ। ভগ্নাংশ কাকে বলে সে জানেই না। তার একমাত্র গর্ব, যে-কোনো সংখ্যাকে সে ২ দিয়ে গুণ বা ভাগ করতে জানে। শুধু ২ দিয়ে, অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে নয়। আর-একটা কথা সে খুব জাহির করতো, জোড় সংখ্যাকে সে ভীষণ অপছন্দ করে। দেখলেই কেটে দেয়।

আশ্চর্যের কথা, ছেলেটির এই সামান্য জ্ঞান দিয়ে তার কাজ সে কিন্তু দিব্যি চালিয়ে নিতো। তার নিজস্ব একটা পদ্ধতি সে নিজেই বার করে নিয়েছিল। যে-কোনো সংখ্যাকে যে-কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারত সে, তার সেই নিজস্ব উপায়ে। অথচ, আগেই বলেছি, সে ২ দিয়ে ছাড়া গুণ-ভাগ করতে জানে না, ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণাও নেই। তবু যে সে কেমন করে কাজ চালাতো তার একটা নমুনা তোমাদের দিই।

ধরো, তাকে বলা হল, ৩৯ কে ৪২ দিয়ে গুণ করতে। সে একদিকে লিখবে ৩৯, অন্যদিকে ৪২। এক দিককে (বাঁ) ২ দিয়ে ভাগ করে (তাও ভগ্নাংশ ছাড়া), অন্য দিককে ২ দিয়ে গুণ করে যাবে। দু-দিকে জোড় সংখ্যা দেখলেই জোড় সংখ্যাগুলো সব কেটে দেবে। তারপর ডান দিকটা যোগ করে উত্তর বার করে দেবে। এবং, অবিশ্বাস্য লাগবে শুনতে, গুণফল ঠিক-ঠিকই বেরুবে। যেমন, আগের অঙ্কটা সে করবে এইভাবে :

	৩৯	×	৪২
	১৯	×	৮৪
	৯	×	১৬৮
*	৪	×	৩৩৬
*	২	×	৬৭২
	১	×	১৩৪৪

এই তার পদ্ধতি। বাঁ দিকটাকে ২ দিয়ে ভাগ করে গেছে, ডান দিককে ২ দিয়ে গুণ। দু-দিকেই জোড় সংখ্যা আছে বলে সে চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনকে (তারা-চিহ্নিত) একদম উড়িয়ে দেবে। তারপর কী রইল দেখ :

৩৯	×	৪২
১৯	×	৮৪
৯	×	১৬৮
১	×	১৩৪৪

এবার ডান দিকের সারি যোগ করা। ৪২+৮৪+১৬৮+১৩৪৪=১৬৩৮। ব্যস। উত্তর ১৬৩৮। যে-কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। কী মজার ব্যাপার। তাই না?

সেরা ওপনার পঙ্কজ রায়

পদ্মশ্রী পাওয়ার পর, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে, সস্ত্রীক পঙ্কজ রায়

স্ট্রাইকার

পঙ্কজলাল রায়, ক্রিকেট-ভক্তের কাছে নামটা আরও ছোট—পঙ্কজ রায়। চেনাচিনির বাউন্ডারির মধ্যে অনেকেই ডাকেন 'মনা'। লাল শব্দটা আসল নাম থেকে ফস্‌কে গেলেও রেহাই নেই। ক্রিকেটের রেকর্ড-বই কিন্তু পঙ্কজ রায়ের নামে লালে লাল। যত রেকর্ড, ততই জমজমাট কাহিনী।

পঙ্কজ রায়ের রেকর্ডের কথা পাড়ছি। তবে শুরুটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড দিয়েই হোক্‌। কুড়ি বছর আগের কাহিনী। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সেটা ছিল মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট। বিনু মাঁকড় ও পঙ্কজ রায় ভারতের ইনিংসের বনেদ গাঁথতে শুরু করলেন। রান উঠছে তো উঠছেই। একশো, দুশো, তিনশো, চারশো দিব্যি টপকে গেলেন। দুজনের যখন ছাড়াছাড়ি হল, বোর্ডে তখন ঝলমল করছে—ভারত এক উইকেটে ৪১৩। সেই ইনিংসে পঙ্কজ করেন ১৭৩, আর মাঁকড়ের ডাবল সেনচুরি, ২৩১। টেস্টে প্রথম উইকেটজুড়িতে ওই বিরাট রান আজও কেউ টপকাতে পারেনি।

রণজী ট্রফির প্রথম খেলাতেই পি রায় জবরদস্ত টক্কর মেরেছেন। উনি যে হরেক রেকর্ড গড়বেন, সেটা প্রথম ম্যাচেই মালুম হয়েছিল। ত্রিশ বছর আগে বাংলার হয়ে সেই প্রথম রণজী ট্রফি খেলতে নেমেছিলেন। তখন সতের বছরের ক্রিকেটার। ওই বয়সেই তোয়াক্কাহীন খেলার ধাঁচ। মার মার করে একশো করলেন। উত্তর প্রদেশের কোনো বোলার ও'কে কব্জা করতে পারল না। পি রায় ১১২ নট আউট।

খেলতে খেলতে রণজী ট্রফিতে পঙ্কজ রায় থরে-থরে রেকর্ড সাজিয়েছেন। ব্যাটধারী হিসাবে এরকম বুক-ফোলানো কাণ্ড বরোদার বিজয় হাজারে ছাড়া আর কারই বা আছে। দশ বছরের তফাতে গড়েছেন দুটি অবাক-করা রেকর্ড। দুটি রণজী ম্যাচেই দু-দফায় জোড়া সেনচুরি। একটি '৫৩-৫৪ মরশুমে ওড়িশার বিরুদ্ধে ১৭০ ও ১৪৩ রান। তখন পঙ্কজ রায়ের চোখে চশমা ওঠেনি। আবার '৬২-'৬৩ মরশুমে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১১২ ও ১১৮ রান। ওয়েস্ট ইনডিজের গিলক্রিস্টের মত একরোখা ফাস্ট বোলার তখন হায়দরাবাদ টিমে। পঙ্কজ রায়কে ঠেকাতে না-পেরে গিলক্রিস্ট রেগে কাঁই। এমন একজন ফাসট-বোলারের বলকে পঙ্কজ রায় চাবকেছেন চশমা পরেই।

রণজীর খেলায় পঙ্কজ রায়ের আটান্নটি ম্যাচে ৫১৪৯ রানকে হনুমন্ত আর হাজারেই টপকে গেছেন। দুটি মরশুমে ছ'শো রানের কোঠা পেরিয়েছেন দু-বার। এমন রেকর্ড হাজারে আর ওয়াড়েকর ছাড়া আর কারও নেই। রণজী ট্রফিতে পর পর চারটি ইনিংসে সেনচুরি করার হিম্মত একমাত্র পঙ্কজ রায়েরই হয়েছে। শুধু বাংলা নয়, তামাম পূর্ব-ভারত থেকে এরকম খানদানি ব্যাটধারী ভারতীয় টেস্ট টিমে কখনো খেলেনি। একবার ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন খোদ লর্ডসে।

এগারো হাজার আটশো আটষট্টি রান—এটি পঙ্কজ রায়ের ১৮৬টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচের মূলধন। ধরা যাক্‌ পঙ্কজবাবুকে একটি অনুরোধ করা হল, "পঙ্কজবাবু,

আপনার সেই কাল্পনিক রানের পাহাড়ের সামনে একবার ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ স্ট্রোকটা দেখাবেন।" উনি অবলীলায় তা দেখাবেন। সত্যিই, সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার পঙ্কজ রায়কে এখনও তেমন আলাদা লাগার কথা নয়। শরীরের ওজন কেজি তিনেক মাত্র বেড়েছে। কানের পাশের চুলগুলোয় সবেমাত্র পাক ধরেছে। মাথায় কোঁকড়া চুলের ঝোপটা একটু পাতলা হয়ে এসেছে। বয়সটা হাফ-সেনচুরি থেকে মাত্র তিন বছর তফাতে। এখনো ক্রিকেট নিয়েই ধ্যানস্থ।

বাস্তবিক, ক্রিকেটের চিন্তাতেই এখনো মজে রয়েছেন। ব্যাটে-বলে সরেস ঠোকাঠুকি করেছেন টানা দুই-দশক। এখন অন্য দায়িত্ব। ভারতীয় টেস্ট টিমের প্লেয়ার বাছাই।

মাসখানেক আগের কথা। আমেদাবাদে তার আগের দিন শ্রীলঙ্কা ও ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়েছে। তৃতীয় টেস্ট টিমের নাম বেরল। বাংলার গোপাল ও বরুণ মনোনীত। পঙ্কজবাবু সিলেকশন পর্ব চুকিয়ে কলকাতায় কুমারটুলির বাড়িতে ফিরেছিলেন গভীর রাতে। সকালবেলা দু-চারটি কথার মাঝেই ধরা পড়ল তাঁর মনের আদলটা। পঙ্কজ রায়ের যেন রাজা-রাজা ভাব। অন্তত বাংলার দুটো ছেলে তো তৃতীয় টেস্ট খেলার জন্য ডাক পেয়েছে। তাই মনা রায়ের দারুণ খোশ মেজাজ।

লাখ কথার এক কথা—পঙ্কজ রায় দস্তুরমত খেটে বড় ক্রিকেটার হয়েছেন। নিজের খেলার গুণে টেস্ট টিমে ঢুকেছেন রীতিমত দাপটের সঙ্গে। পি রায়ের টেস্টে প্রথম চান্স পাওয়ার ঘটনাটাও মনে রাখার মত। সেবার (১৯৫১-৫২ মরশুম) ইংল্যান্ড টিম এসেছিল ভারতে টেস্ট খেলতে। চার দফা ট্রায়াল ম্যাচ হল। পঙ্কজ রায় রানের ফোয়ারা ছুটিয়ে সকলকে খুশী করেছেন। পঙ্কজ রায় তখন সাধারণত টিমে ছ নম্বরেই ব্যাট করতেন। খেলা পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডের। দল গড়ার কর্তা সি কে নাইডুর কাছে সরাসরি উনি প্রস্তাব রাখলেন, "আমি ওপেন করব।"

সি কে তো বাংলার নবীন ক্রিকেটারটির কথা শুনে থ। দু-একবার না না করেও শেষে রাজি হলেন। কৃতিত্বের প্রমাণ দিলেন পঙ্কজ রায় ৮৯ রান করে। সোজা কথা নয়—স্ট্যাথাম, রিজওয়ে, টাটারসলের মত বোলারকে পিটিয়ে পঙ্কজ রায় ওই রান পেয়েছেন। খেলার শেষে পঙ্কজ রায় স্নানের ঘরে গরম জলের চৌবাচ্চায় গা এলিয়ে দিলেন। বন্ধ দরজার ওপার থেকে সাংবাদিক ডিকি রত্নাগর বাজখাই গলায় বললেন, "কনগ্র্যাচুলেশনস পঙ্কজ।" সাংবাদিকের কথা শেষ করতে দিলেন না উনি। পাল্টা জবাব দিলেন, "তোমার এই ধন্যবাদের কারণ নিশ্চয়ই প্রথম টেস্ট টিমে চান্স পাওয়ার জন্যে।" নিজের খেলার উপর এমনি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস আঁকড়েই দিল্লিতে প্রথম টেস্টে বিজয় মার্চেন্টের জুটিতে পঙ্কজ রায় ভারতের ইনিংস ওপেন করতে নামলেন। স্যাকরার ঠুকঠাকের মতই টুকটাক করে রান নিয়ে পৌঁছলেন ১২ রানে। পঙ্কজ রায় আউট। কী খেয়াল হয়েছে, একটা সিধা উইকেটের বলকে কায়দা করে বাউন্ডারিতে পাঠাতে গিয়েই স্যাকলটনের বলে বোলড। কলকাতায় ফিরে পঙ্কজ রায় ধরেই নিলেন পরের টেস্টে বোধহয় তাঁকে আর ডাকা হবে না। তবু মন দিয়ে ময়দানের ম্যাচগুলো খেললেন। তিনটে ম্যাচেই সেনচুরি। অবাক কাণ্ড, বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে আবার খেলতে ডাক পেলেন।

বোম্বাইয়ে হাজির হয়েই কঠিন জেরার মুখে পড়েছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বিজয় মার্চেন্ট একটু ঠোঁটকাটা লোক। জিগ্যেস করলেন "পঙ্কজ, এই মাঝের কদিন কী ম্যাচ খেলেছ?" জবাবে উনি হিসাব দিলেন ওই কলকাতা ময়দানের তিনটি সেনচুরির। মার্চেন্ট অত ছোট ম্যাচের কারবারী নন। পঙ্কজ রায়ের মধ্যে রান করার জিদ বাড়াতে বললেন, "ওই সেনচুরির জন্য তোমার প্রাপ্য ধন্যবাদ তোলা রইল। এখানে টেস্টে একটা সেনচুরি বানাও, আমি তোমায় কনগ্র্যাচুলেশনস জানাব।" সাক্ষাৎ আরব্য উপন্যাসের ভেল্কি। পঙ্কজ রায় সে-ম্যাচে তোফা সেনচুরি পেটালেন—১৪০। বিজয় হাজারে করলেন ১৫৫।

সেনচুরি করেও শান্তি নেই। দিনের শেষ বলে উনি আউট হয়েছিলেন। চটাপট চটাপট শব্দে চারিদিকে হাততালির বন্যার মধ্য দিয়ে ঢুকলেন ড্রেসিংরুমে। পঙ্কজ রায়কে নিয়ে ড্রেসিংরুমে দারুণ হৈ-চৈ। ইতিমধ্যে মার্চেন্টও ধন্যবাদের পাওনা চুকিয়েছেন। পঙ্কজ রায়ের মনের অবস্থা, "সারা বিশ্ব যেন আমার পায়ের তলায় দুলছে। আমি যেন কী একটা বিরাট কাণ্ড করে ফেলেছি।" মুখ ফুটে তাঁর মনের ডগমগে অবস্থাটাও বারবার ফাঁস হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে পরিবেশের তপ্ত ভাবটা কাটতেই পঙ্কজবাবুর নজরে পড়ল—আরে, ঘরের ভেতর এত কাণ্ড ঘটছে, কিন্তু একটা লোক তো একদম স্পিকটি নট। নিজের মনে কেমন প্যাডের ফিতে খুলে চলেছেন। এই চুপচাপ লোকটি বিজয় হাজারে। দিনের শেষে ৯০ নট-আউট। কিন্তু তাঁর হাবভাবে আদৌ এক-ফোঁটা অহঙ্কারের ছোঁয়াচ পর্যন্ত নেই। প্যাড খোলা শেষ, সামান্য কটি কথার জন্য উনি মুখ খুললেন। প্রথম টেস্ট-সেনচুরি-পাওয়া পঙ্কজ রায়কে উদ্দেশ করে বললেন, "পঙ্কজ, এমন সেনচুরি অনেক পাবে। এত আত্মহারা হওয়ার কী আছে। লোকে তোমাকে নিয়ে হৈ চৈ করতে পারে। করুক, তুমি নিজেকে কখনো জড়াবে না, তাহলে খেলাটি মাটি হবে।" পঙ্কজ রায় মনে মনে হাজারেকে সেদিন প্রণাম জানিয়েছেন। কতবার সেনচুরি করেছেন কিন্তু কখনো তাঁর আচরণে মাত্রা ছাড়াননি।

সেই সিরিজেই মাদ্রাজে পঞ্চম টেস্টে ভারত ইংল্যান্ডকে এক ইনিংস ও আট রানে হারায়। সেটাই ভারতের প্রথম টেস্ট বিজয়। পঙ্কজ রায় সে-টেস্টে ১১১ রান করে দলকে দারুণভাবে সাহায্য করেছেন।

পরের বছরই ভারতীয় দল যায় ইংল্যান্ডে। পঙ্কজ রায় কিন্তু মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। এ নিয়ে তিনি নিজের দোষত্রুটি সবই খোলসা করে বললেন, "ভাল খেলার জন্যে নিজেকে দারুণভাবে সর্বদাই নিয়মে বেঁধে রেখেছি। কিন্তু ইংল্যান্ডের নরম আলোয় জোরে বল ঠিকমত ঠাহর করতে পারতাম না। চোখে আমি কম দেখতাম। কিন্তু এমনি মনের ভুল যে, ভেবেছি, সবাই বুঝি আমার মতোই দেখে। চোখ খারাপের দিকটা নিয়ে ততটা ভাবিনি। সেটাই মস্ত ভুল।"

ভাল খেলতে না পারা নিয়ে পঙ্কজ রায় মনে-মনে দারুণ জেরবার হয়েছেন। তখন তাঁর একটাই সমস্যা, কী করে ফাস্ট বোলারকে ভালভাবে খেলা যায়। ঠিক সেই সময় প্রায় দেবতা-প্রেরিত দূতের মতই পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে আলাপ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বনামখ্যাত ক্রিকেটার লিয়ারি কনস্ট্যান্টাইনের। কনস্ট্যান্টাইন ওঁকে বলেন, "তোমরা ইংল্যান্ড ট্যুরের একবছর বাদেই তো আমাদের

ওখানে যাবে। ওখানেও ফাস্ট বোলার আছে প্রচুর। কী করে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবে?" ভালমানুষ লিয়ারি নিজেই বাতলে দিলেন সমাধান। বললেন, "স্বাভাবিক-ভাবে যেরকম ব্যাট করার সময় পা কাছাকাছি রেখে দাঁড়াও. তার অভ্যাসটা বদলানো দরকার। দু-পায়ের মধ্যে ফাঁকটা আরও বড় হবে। আর ব্যাট হাতে ডান-হাতি ব্যাটধারীর শরীরের যত ঝোঁক থাকবে বাঁ-পায়ের উপরে। ডান-পাটা প্রায় ফ্রি। বাঁ-পা ওইরকম থাকলে চট্ করে ফরোয়ার্ড খেলায় মস্ত সুবিধা হবে, ডান-পা ওইরকম আলগা থাকলে অচ্ছাসে ব্যাক-ফুটেও স্ট্রোক করা যাবে।"

বাংলার ওই সেরা ব্যাটধারী টেস্ট খেলতে-খেলতে চৌদ্দবার শূন্য হাতে ফিরেছেন। এজন্যে তাঁর আফশোষ রয়েছেই। পিঠোপিঠি তাঁর পাঁচটা সেনচুরিসহ দু-হাজারের রানের অঙ্কটাকেই লোকে বিরাট বলে মানে। তাঁর প্রতিটি বড় ইনিংস গড়ার মধ্যে একটি মনোভাবই কাজ করেছে। ত্রিশ-চল্লিশ রান পর্যন্ত বলকে ব্যাটের ব্লেডের মাঝখানে নেওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এতে বলের সঙ্গে ব্যাটের ভাবটা ধীরে ধীরে জমে ওঠে। ক্রমশ এর পর থেকে বড় রানে যেতে পারলে ব্যাটের ধারগুলোকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ব্যাটধারী তুমি, আশি থেকে একশো রানের রাস্তায় খুবই হুঁশিয়ার থাকো। তবেই সেনচুরি পেতে পার— সেনচুরি করার ব্যাপারে পঙ্কজ রায়ের এই ফরমুলাটা বারবার কাজ দিয়েছে।

ব্যাটধারীকে চোখ-কান খাড়া রেখে খেলার মধ্যে বুঁদ হয়ে যেতে হবে। তাহলে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার সময় ১৭৩ রানটাকে ঠেলে ডবল সেনচুরিতে টেনে নিয়ে যেতে পারলেন না কেন? ওঁর জবাব, "হঠাৎ মন-আলগা হলাম আর কুপোকাত। সে-ম্যাচে বিনু দুশো পার করতেই আমাদের ক্যাপ্টেন উমরিগড় মাঠে চিরকুট পাঠান। তাতে লেখা ছিল, বলে বলে পিটিয়ে রান তোল। কিন্তু কী ভাবল জানি না। আমি ধরলাম, উমরিগড় বোধহয় এক্ষুনি ডিক্লেয়ার করবেন। তাই এই রানের জন্য ব্যস্ততা। এই-ভেবে তাড়ু ব্যাটধারী হতে গিয়েই বিপদ ঘটল, আউট। পরে উমরিগড় নিজে অনেকক্ষণ খেলে ৭৯ রান করেছিল সেই ইনিংসে। আসলে এই ছোটখাট ভুলই ক্রিকেট ম্যাচে কত তোলপাড় ঘটিয়ে দেয়।"

যে কোন ওপেনিং ব্যাটধারীর জীবনেই ফাস্ট বোলার পয়লা শত্রু। ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজের খেলাটিকে পঙ্কজ রায় পাকা করার চেষ্টাতেই যেন তাঁর মাথার চুল পাকিয়েছেন। লিন্ডওয়াল, ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম, কিং, হল, গিলক্রিস্ট প্রমুখ জাঁদরেল ফাস্ট বোলারের সঙ্গে পঙ্কজ রায়কে পাঞ্জা কষতে হয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র ট্রুম্যান ছাড়া আর-কাউকে তাঁর তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয়নি। ফাস্ট বোলার মেজাজে সদাই 'নুন ছাড়াই খেয়ে ফেলব' ভাব দেখাবেই। পঙ্কজ রায়ের কাছে বল হাতে খাব-খাব ফাস্ট বোলার ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রয় গিলক্রিস্ট।

সেটা ছিল ১৯৬২-৬৩ ক্রিকেটের মরশুম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চার বোলার গিলক্রিস্ট, কিং, স্টেয়ার্স ও ওয়াটসন এসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন দলে খেলতে। এতে ফাস্ট বোলিংয়ে ভারতীয় ব্যাটধারীরা অভ্যস্ত হবে। গিলক্রিস্ট ছিলেন হায়দরাবাদ দলে। রণজী ট্রফিতে খেলা পড়েছিল ইডেনে বাংলা ও হায়দরাবাদের মধ্যে। তার আগেই কানপুরে একটি খেলা থেকে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে গিলক্রিস্টের রেষারেষিটা উঠেছিল তুঙ্গে। গিলক্রিস্টের ভাবটা এইরকম : পঙ্কজ রায়কে সামনে পেলে আস্তই কড়মড়িয়ে সাবাড় করে দেব। বাংলার ছেলেরা যাতে ভাল খেলে সেজন্যে একজন ক্রিকেট অনুরাগী ঘোষণা করেন, বাংলার কেউ সেনচুরি করলে অথবা পাঁচটি উইকেট নিলে দুশো টাকা করে দেবেন। পঙ্কজবাবুও আগে থেকেই বলেন, আমি তাহলে দুশো টাকা নির্ঘাত পাবই।

খেলা শুরু হতেই বাউনসার-বোমার বৃষ্টি হয়েছে পঙ্কজ রায় এবং বাংলার ব্যাটধারীদের উপরে। অক্লেশে তাঁরা খেলে গেছেন, পঙ্কজ রায়েরও এমনি রোখ চেপে গেছে যে, দু-ইনিংসেই সেনচুরি ১১২ ও ১১৮ হাঁকড়েছেন। শেষে কিছুতেই কিছু নয়। গিলক্রিস্ট রেগেমেগে পঙ্কজবাবুকে আন্ডার আর্ম বল করেছেন।

খেলার মধ্যেই যত রাগারাগির নিষ্পত্তি হয়েছে। খেলাশেষে পঙ্কজবাবু গেছেন নিউ-মারকেটে এটা-সেটা কিনতে। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানীর দাঁড়িপাল্লার দিকে উনি চেয়ে আছেন। হঠাৎ একটা কালো হাত ওকে জাপটে ধরতে চাইল। পঙ্কজবাবু ভাবলেন, আরে, এ কী বিপত্তি। অমনি হাতের বেড়া থেকে গলে ফুরুত করে একটু পাশে সরে দাঁড়ালেন। পিছন ফিরে দেখেন, হা-হা-হা করে বিকট হাসি হাসছেন গিলক্রিস্ট।

প্রতিটি প্লেয়ারের জীবনে একটা সময় আসে যখন সব কিছুই খারাপ লাগে। সেই ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের ঠিক আগেই পঙ্কজবাবু ওইরকম মনের অসুখে দারুণ কাবু হয়েছেন। হায়দরাবাদে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে 'জিরো' করে ফিরে আসতেই চারিদিকে সবাই রটাল, পঙ্কজ রায় চশমা নিয়েছেন. এখন আর চোখে তেমন বল দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর বারোটা বেজে গেছে। টেস্ট খেলা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

মনের দুঃখে কলকাতায় ফিরে এসে প্র্যাকটিসে মন দিলেন। চার ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত বল পিটিয়েছেন। পঙ্কজ রায়ের মতে সবচেয়ে মজা হল, "চশমা পরে আমি বল আগের চেয়ে অনেক ভাল দেখছিলাম। কিন্তু লোককে বোঝান দায়। যে-কেউ সামনে আসে আর যেচে জ্ঞান দেয়— আহা, পঙ্কজ, চোখটাই তোমায় অসুবিধায় ফেলল। কাঁহাতক আর তাদের ভুল ভাঙি। কিছুতেই কিছু নয়। শেষে জিদ চেপে গেল, যে করে হোক্ আমায় কিছু-একটা করে দেখাতে হবে যে, আমি চোখে ভালই দেখি।

"ঈশ্বর, আমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। ইডেনে ডাক পেলাম। তবে ওপনার হিসাবে নয়, ওয়ান ডাউন যেতে হবে। নির্বাচকদের মনের ভাবটা যেন,—পঙ্কজ তুমি ঘরের মাঠে লাস্ট চান্স খেলে নাও। না পারলে শেষমেষ গলাধাক্কা খাবে। সে-ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে দাঁত কামড়ে ১০০ পিটিয়েছেন। তখন তাঁর একটা জিনিস খেয়াল হল, চারপাশের সেই উটকো লোকগুলো আর ভ্যানর-ভ্যানর করছে না। আহা, পঙ্কজ. তোমার চোখটা খারাপ হয়েছে, খারাপ হয়েছে—এ আওয়াজটা তখন থেকে কমতে শুরু করল। পরের টেস্টে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতেই সবাই মুখে কুলুপ আঁটল।"

বিনা মাঠেই ভেলকি দেখাচ্ছে

'রানী রাসমণি'র ছেলেরা

ঝাঁকড়া ডালপালা মাথায় বটগাছটার কোলেতেই স্কুল-বাড়িটা দাঁড়িয়ে। স্কুলের নাম রানী রাসমণি। বয়স ৩৮ বছর। কিন্তু বটগাছটার বয়সের ঠিক-ঠিকানা নেই। বটগাছটাই এখন যেন ইতিহাস, আর রানী রাসমণির নামে স্কুল। দুয়ে মিলে ব্যাপারটা কতকটা যেন ইতিহাসের কোলেই আর-এক ইতিহাস আদর খাচ্ছে।

যারা খেলা ভালবাসে, তাদের কাছে রানী রাসমণির নামাঙ্কিত এই স্কুলটা চেনা-চেনা ঠেকা অসম্ভব কিছু নয়। থাক খেলার কথা। আগে বরং স্কুলের পরিচয়ের পেথমটা আরও মেলে ধরি। ছয় শ ছেলে এই স্কুলে পাঠ নেয়। আর্ট, সায়েন্স, কমার্স পড়ার সুযোগ আছে। ভারততীর্থ কবিতার মর্মটা এই স্কুলে এলে সত্যিই টের পাওয়া যাবে: ভারতের হরেক ভাষাভাষী ছেলে এই স্কুলে পড়ে। বাংলা-হিন্দী দু-রকম মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থাই আছে এখানে। বেশিরভাগ অভাবী পরিবারের ছেলেদেরই এখানে যত ভিড়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সব ছাত্রই উতরে যায়।

মধ্য কলকাতায় সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডের উপর এই স্কুলের উপর খেলুড়ে ছাত্রদের নজর একটু আলাদা রকমের। ময়দানের এত কাছে, কিন্তু ওদের মাঠ নেই। আশ্চর্য, এই স্কুলের খেলোয়াড়রাও যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে মানুষ। তালতলা, জানবাজার, এণ্টালি এলাকার সব জায়গা বাড়ি, গাড়ি, মানুষে গাদাগাদি, ছেলেরা হাত-পা ছুঁড়বে কোথায়? তবু, আশ্চর্য ব্যাপার, ওই সব পাড়ারই স্কুল রানী রাসমণি থেকে ভাল খেলোয়াড় বেরনোর কাজে কোন ভাঁটা নেই। ফুটবলের মোহন সিং, স্বপন সেনগুপ্তর লেখাপড়ার চোখ ফুটেছে এই স্কুল থেকেই। ক্রিকেটে দুই ব্যানার্জী উদয়ভানু ও গৌতমও এই রানী রাসমণির ছাত্র। হকিতে শৈবাল মুখার্জী, রঞ্জন দাশ, গৌরবন্ধু দত্ত প্রমুখ নামী প্লেয়াররাও স্কুলজীবনে এই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়টির জার্সি গায়ে দিয়েছেন। কলকাতার নানা ক্লাবের খেলোয়াড়ের তালিকা ঘাটলে আরও শতখানেক প্লেয়ারের নাম পাওয়া যাবে, যাঁরা কৈশোর কাটিয়েছেন ওই বিদ্যাপীঠে।

স্কুল-বাড়িটার দিকে খুঁটিয়ে তাকালে আদৌ ভক্তি হবে না। স্কুলের বেঞ্চি বা ক্লাসরুমের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। যদিও কয়েকটা ঘরে উপর-উপর সারানোর চেষ্টা হচ্ছে, বাকির বড় দুরবস্থা। স্কুল চত্বরে একফালি জমিও নেই যে, টিফিন পিরিয়ডে ছাত্রদল একটু হাত-পা মেলে ছোটাছুটি করবে। ওরই মধ্যে সামান্য জায়গা ঘিরে এক চিলতে বাগান, সেখানে

মাস্টারমশাইদের সুশিক্ষার দরুন কেউ ভুলেও একটি পাতা ছেঁড়ে না বা ফুলে হাত দেয় না।

স্কুলের নিজস্ব কোনও মাঠ নেই। তাহলে রানী রাসমণি খেলোয়াড় তৈরি করে কীভাবে? ময়দানপাড়ার স্কুল হওয়ায় মস্ত সুবিধা। এই সুবিধাটুকু চুটিয়ে কাজে লাগান কয়েকজন খেলাপাগল মাস্টারমশাই ও প্রাক্তন ছাত্র। গেম-টীচার বিমলবাবু খেলা নিয়ে মশগুল। স্কুলের খেলার ইতিহাস নিয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। শুধু মাত্র সুইচ টেপার অপেক্ষা। গড়গড় করে বলে চললেন। যেন ক্লাসে ইতিহাস পড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছেলেরা কে কেমন খেলত তাও দেখালেন হাত-পা নেড়ে। দু-একবার বিরতি ঘটল সশব্দে নস্যি নেওয়ার জন্যে। শ্রোতার ভূমিকায় আমাদের পাশে বসা আর একজন মাস্টারমশাইয়ের চোখ দুটো মাঝে মাঝে বড় হয়ে উঠেছে। ইনি অধীর দাস। স্কুলের ভাল-মন্দের চিন্তায় জীবন সঁপে দিয়েছেন।

রানী রাসমণির প্লেয়াররা প্রথম বিখ্যাত হয়েছে তাদের ফুটবল খেলার গুণে। ষাট আর সত্তর দুই দশকেই তারা দুটি খেলায় ভারত-জোড়া সুনাম পেয়েছে। স্কুল ফুটবলের সেরা ট্রফি সুব্রত কাপের খেলা চালু হয় ১৪ বছর আগে। বাঙালী ছেলেরা ফুটবলের পোকা। কথাটা ষোল আনা খাঁটি। রানী রাসমণি প্রথমবার সুব্রত মুখার্জী কাপে খেলতে নেমে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তার প্রমাণ রাখল। মাঝে শুধু এক বছরের ফাঁক। ১৯৬৩-তে রানী রাসমণি রানার্স-আপ হয়েছে। একটা জিনিস লক্ষ করার, রানী রাসমণিকে প্রথমবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় কোনও জিদে পায়নি। পরের দু-বছর আনকোরা নতুন টিম করার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। শুধু সুব্রত মুখার্জী কাপই নয়। একষট্টি থেকে চৌষট্টি সাল রানী রাসমণি স্কুল-ফুটবলের নামকরা সব টুর্নামেন্টেই দাপট দেখিয়েছে। বঙ্কিম কাপ, বিপ্লবী বারীন্দ্র শীল্ড, স্বর্ণবিদ্যুৎ শীল্ড, বিবেকানন্দ চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রভৃতি টুর্নামেন্টে সে সময় রানী রাসমণির নামে অন্য সব স্কুল-টিম রীতিমত ভয় পেত।

সত্তরের দশকে রানী রাসমণির ছেলেরা হকি নিয়ে দারুণ মাথা ঘামাচ্ছে। একাত্তর সালে তারা রাজ্য স্কুল হকির সেরা টুর্নামেন্টে পঙ্কজ গুপ্ত মেমোরিয়াল ট্রফিতে রানার্স-আপ হয়েছে। মাঝে শুধু এক বছর তেমন ভাল করতে পারেনি। কিন্তু গত তিন বছর ধরে রানী রাসমণি এ রাজ্যের হকির চ্যাম্পিয়ন স্কুল। ফলে গত তিন বছর তারা জুনিয়র হকিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। নেহরু হকিতে সারা ভারতের সব চ্যাম্পিয়ন স্কুল যোগ দেয়। ছোটদের টুর্নামেন্ট, কিন্তু বয়স ভাঁড়ানোর মত ভেজাল ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। পঁচিশ বছরের ছেলে হামেশা ১৭।১৮ বছর হিসাবে অক্লেশে চালিয়ে দেয়। রানী রাসমণি ওসব গোঁজামিলে নেই।

'ব্যাড লাক' ওদের প্রথম থেকেই পিছু নিয়েছে। পাথর চাপা কপাল—প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনাল টাই-ব্রেকারে হেরে দিল্লির ময়দান থেকে উঠে আসে, সত্যিই দুর্ভাগ্য, গত দু বছর তারা নেহরু হকিতে গ্রুপের কোঠা থেকেই ফেরত আসে। শুধু গোল অ্যাভারেজ আর ন্যূনতম পয়েন্টের ব্যবধানই তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে দিল না। একটা অদ্ভুত রেকর্ড, গত দু বছরে রানী রাসমণি নেহরু ট্রফিতে কোনও স্কুলের কাছে মাথা নোয়ায়নি।

রানী রাসমণির তেজীয়ান টিমের পিছনে রক্ত জল করা অঢেল পরিশ্রম আছে। বাইশজনের একটি ছাত্রদলকে তাঁরা হকির পাঠ দিতে ময়দানে এক চিলতে মাঠের জোগাড় করতে তিন বছর ধরে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। প্রশিক্ষণের কাজে ও'দের প্রেরণার সলতেটি উসকে দেন লেসলি ক্লডিয়াস। মাত্র এক কাপ কফির বিনিময়ে লেসলি প্রত্যহ ওদের নিয়ে তিন ঘণ্টা নাড়াচাড়া করেছেন। সঙ্গে ছিল নুটু, মানু, নান্দু, ঝুপু,

"যদি এক চিলতে মাঠ পাওয়া যায় তো আমরা খেলার জগতে হরেক ভেল্কি দেখাতে পারি।"—এটাই ওদের জোরালো প্রতিশ্রুতি।

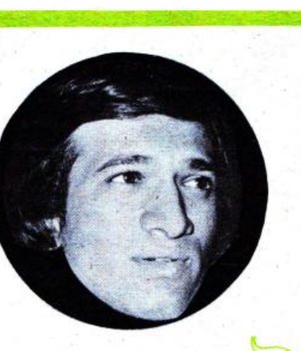

বাপ কা বেটা

অশোক, অতুল, রাহুল—তিন ভাই। ওরা ভারতের প্রাক্তন চৌখশ ক্রিকেটার বিনু মাঁকড়ের ছেলে। অলরাউন্ডার ক্রিকেটার বিনুকে সকলেই এক নম্বর মানে। বাপের মত তিন ছেলেকেও ক্রিকেটে পেয়েছে। বড় ছেলে অশোককে টেস্ট প্লেয়ার হিসাবে কে না জানে। কিন্তু বাপের সব গুণগুলো তার মধ্যে তেমন খেলেনি। সত্যিই, অমন বাপের মত অবিকল হওয়া কি সোজা কথা। বিনু বিনুই। মেজ ছেলে অতুলও তেমন কিছু পারল না। এখন ভরসা রাহুল। বিনু নিজেও ভাবেন, রাহুল তাঁর মত কিছু করলেও করতে পারে। রাহুলও বাপের ধাঁচেই ব্যাট-বল নিয়ে মাঠে চলাফেরা করে; খেলে।

শুরু থেকেই রাহুলের উপর বিনুর কড়া নজর। পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে সি কে নাইডু ট্রফি খেলতে রাহুল কলকাতায় এসেছিল। জানাল, "বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিস করার হাজার ঝামেলা। একটু এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। ফিল্ডিং করতে করতে হাত লাল হয়ে যায়, শরীর টনটন করে ওঠে। কিন্তু উনি নাছোড়। বাড়িতে গিয়ে মা, দাদা, বৌদি কাকে বলব? সবাই একসঙ্গে ধমকে ওঠে।

রাহুলের বয়স কুড়ি। এরই মধ্যে সে বিলেত ঘুরে এসেছে। গত ক্রিকেট মরশুমে ওখানে সে এসেক্স লীগে চল্লিশটা ম্যাচ খেলেছে। রানও ঝুলিভর্তি—১৩৫০। বাপের কথা মন দিয়ে শোনে। খেলতে-খেলতে একটু একটু হাত জমলেই পেটায়। ল্যাটা হাতে বাপের কায়দায় সে স্পিন করায়। ফিলডিংয়েও ডাকাবুকো। ব্যাটের ডগায় ও'ত পেতে বসতে আদৌ ঘাবড়ায় না। ওর বাবার মতই আর-এক প্রাক্তন অলরাউন্ডার পলি উম্রিগড়ও রাহুলকে কোচ করেন। ব্যাট হাতে রাহুলের ভাবনা—কী করে এক্সট্রা কভারে ড্রাইভ ও স্কোয়ার কাটকে গুলে খাওয়া যায়।

রাহুলের দুটি স্বপ্ন—টেস্ট খেলা ও ইংল্যাণ্ডের মাঠে বাবার মত খেলে যাওয়ার। বি এ ক্লাশের পড়ুয়া। রোজ ভোরে উঠে বোম্বাইয়ের হিন্দু জিমখানার মাঠে ওকে ছুটতে দেখা যায়।

বেশ ধারালো অথচ ফুটফুটে চেহারার রাহুল। মাথায় বাপের চেয়ে দু-ইঞ্চি কম। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। প্রশ্ন করলাম, "বাপের মত হতে পারবে?" রাহুল বলল, "কী, লম্বায়?" বললাম, "না খেলার কথা বলছি।" হো হো করে হেসে মাথা নাড়ল, "ভীষণ কঠিন কাজ।"

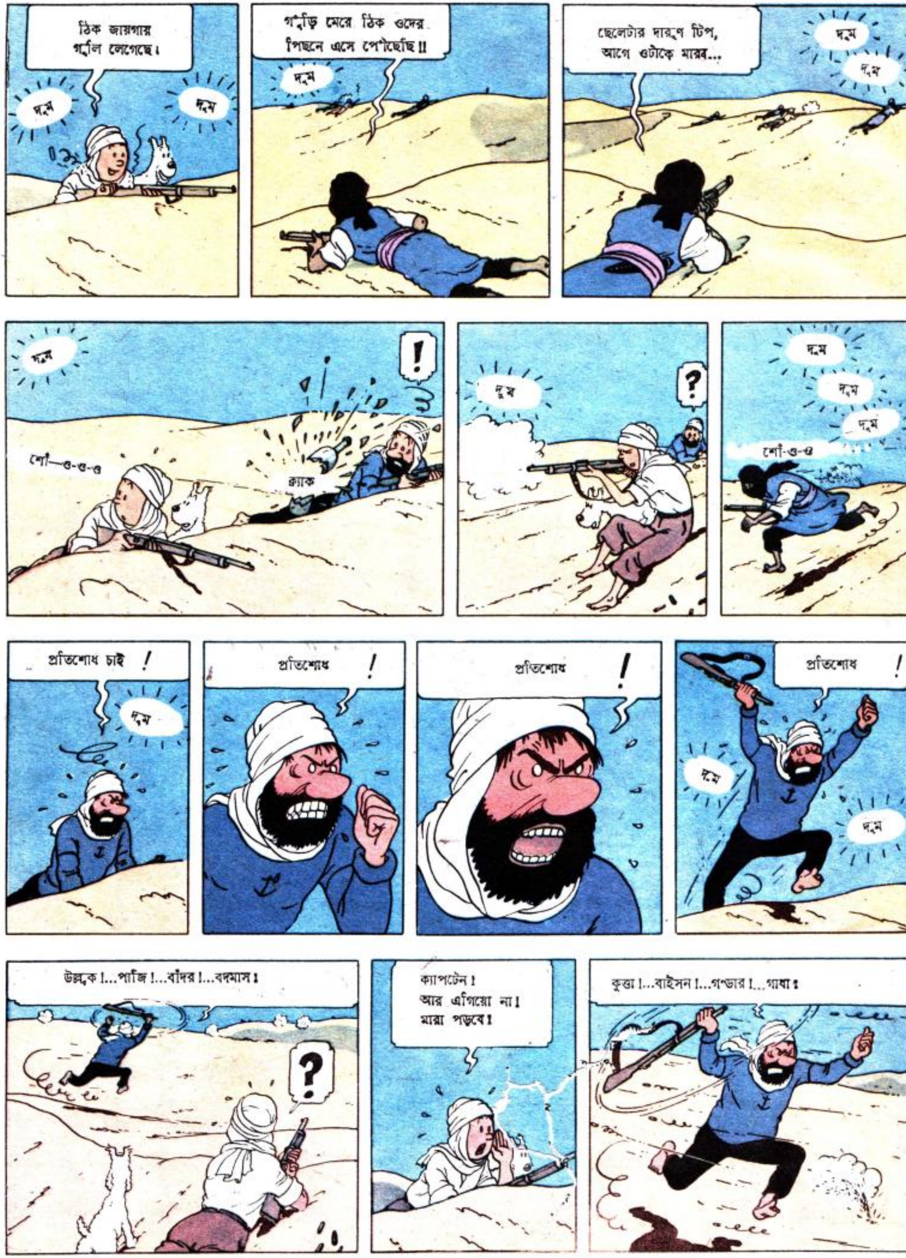
ঠিক জায়গায় গুলি লেগেছে।
দুম
দুম
গুঁড়ি মেরে ঠিক ওদের পিছনে এসে পৌঁছেছি !!
দুম
ছেলেটার দারুণ টিপ, আগে ওটাকে মারব...
দুম
দুম
দুম
শোঁ—ও-ও-ও
ক্র্যাক
!
দুম
?
দুম
দুম
দুম
শোঁ-ও-ও
প্রতিশোধ চাই !
দুম
প্রতিশোধ !
প্রতিশোধ !
প্রতিশোধ !
দুম
দুম
উল্লুক !...পাজি !...বাঁদর !...বদমাস !
?
ক্যাপটেন ! আর এগিয়ো না ! মারা পড়বে !
কুত্তা !...বাইসন !...গণ্ডার !...গাধা !

এর পর পঞ্চাশের পাতায়

ট্রোজান ঘোড়ার গল্প

উমা দাশগুপ্ত

এবারে হোমারকে ছেড়ে দিয়েই তোমাদের ট্রোজান যুদ্ধের বাকিটুকু বলি। রাগারাগি করে তো যুদ্ধ চলছিলই। একের পর এক বীর যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একিলিস্ গেলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল প্যারিসের হাতে। প্যারিসেরও মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর নিজের ধনুকবানেই। দুদিকেই লোকক্ষয় হচ্ছে, যুদ্ধের নিষ্পত্তি হচ্ছিল না। প্যারিস মারা গেলেন, হেলেনকে কিন্তু ট্রোজানরা ফিরিয়ে দিলেন না। প্যারিসের মৃত্যুর পর প্যারিসের ভাই ডাইফোবাস হেলেনকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ডাইফোবাসই তখন ট্রোজানদের নেতা। গ্রীকরাও পড়লেন বিপদে। কী করা উচিত কেউ বুঝতে পারছিলেন না। মুশকিল আসান করলেন ইথাকার রাজা তীক্ষ্ম বুদ্ধিশালী ইউলিসিস্। তাঁরই মাথায় এল বিশ্ববিখ্যাত সেই কাঠের ঘোড়ার পরিকল্পনা। গ্রীকদের তিনি বুদ্ধি দিলেন গাছ কেটে এক প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া তৈরী করবার জন্য। সেই ঘোড়া হবে ফাঁপা, এবং তার মধ্যে থাকবেন সবচাইতে বীর গ্রীক যোদ্ধারা। বাকী গ্রীক যোদ্ধারা জাহাজে উঠে পাশের দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে থাকবেন। ট্রোজানরা মনে করবেন, শত্রু ফিরে গেছে। এই সুযোগে ট্রোজানরা ঘোড়া দেখবার জন্য শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। ভাবতে থাকবেন কেনই বা ওই কাঠের ঘোড়া তৈরী হয়েছিল, কেনই বা সেটা পড়ে রইল। একজন গ্রীক যোদ্ধা আশেপাশেই থাকবেন, দেখবেন যাতে কাঠের ঘোড়ায় আগুন না লেগে যায়। ট্রোজানদের ইনি বোঝাবেন যে, সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গ্রীকেরা বাড়ি ফিরে গেছেন। অথচ পথে যেতে যাতে তাঁদের ঝড়ে না পড়তে হয়, তাই তাঁরা দেবী প্যালাসকে তুষ্ট করে যেতে চেয়েছিলেন। ট্রয়ে প্রতিষ্ঠিত এই দেবীমূর্তিকে ইউলিসিস্ চুরি করে পালিয়ে ছিলেন। সেই ভয়ে আজ গ্রীকেরা এই কাঠের ঘোড়া তৈরী করে দেবীর পুজো দিয়ে গেছেন।

তাই হল। সত্যিই গ্রীক সৈন্যদল আইডা পাহাড়ের গাছ কেটে কেটে তিনদিনে ওই ঘোড়া তৈরী করে ফেললেন। ইউলিসিসের নির্দেশে তারপর সেই যন্ত্রটির ভিতরে সবচাইতে ভাল গ্রীক যোদ্ধারা ঢুকে পড়লেন। একজন শুধু বাইরে থাকলেন, সাইনন। দূর থেকে ট্রোজানরা দেখলেন গ্রীক নৌবাহিনী ফিরে যাচ্ছে। কাঠের ঘোড়া রয়ে গেল। কৌতূহলে তাঁরা ছুটে এলেন। ব্যাপার কী? ওর উত্তর সাইনন দিলেন। ট্রোজানদের ঠকানোর জন্য তাঁর গল্প তৈরীই ছিল। সব শুনে কাঠের ঘোড়াকে ট্রয় শহরের ভিতরে দেবী-মন্দিরের সামনে নিয়ে যাবার জন্য ট্রোজানরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ঘোড়ার পায়ে চাকা পরানো হল, দড়ি বাঁধা হল। ট্রোজানরা সকলেই ঘোড়া টানায় হাত লাগালেন। মেয়েরা, শিশুরা সকলে—নাচগানের মধ্যে। রাজপ্রাসাদের কাছে ঘোড়া নিতে নিতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে গ্রীক নৌবাহিনী তীরবেগে ফিরে আসছিল।

একজন ট্রোজানের মনে কিন্তু সন্দেহ জেগেছিল। ডাইফোবাসের। তিনি কিন্তু হৈহৈ-এর মধ্যে ছিলেন না। ঘোড়ার ভিতরে কেউ রয়েছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি হেলেনের সাহায্য নিলেন। গ্রীক নেতাদের সকলকে হেলেন চিনতেন। তাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের কোন স্বরে ডাকতেন তাও জানতেন। ডাইফোবাসের আদেশে হেলেন সেই কাঠের ঘোড়ার মুখোমুখি হয়ে একের পর এক গ্রীক নেতাদের নাম ডেকে গেলেন। এমন কী, তাঁর স্বামী মেনেলাউসকেও ডাকলেন। ভিতরে বসে ইউলিসিস সব বুঝতে পেরেছিলেন। হেলেনের ডাকে কাউকে উত্তর দিতে দেননি। চুপটি করে বসে রইলেন তাঁরা ঘোড়ার ভিতরে।

নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রোজানরা ফিরে গেলেন। সব চুপ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে ঘোড়ার এক কোণের দরজা খুলে গ্রীক নায়কেরা নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। কেউ কেউ শহরের গেটে চলে গেলেন দলের অন্য সৈন্যদের ভিতরে ঢুকিয়ে নেবার জন্য। আবার কেউ কেউ শহরের ভিতরের বাড়িগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন। কী অদ্ভুত খুনোখুনি চলেছিল। কত কান্না, কত চিৎকার শোনা

গিয়েছিল। ট্রোজান রাজা প্রায়াম বাড়ির উঠানে বসে ব্যর্থ প্রার্থনা করছিলেন। এক গ্রীক নায়ক এই বৃদ্ধ রাজাকে পর্যন্ত এক মুহূর্তে হত্যা করে ফেললেন। মেনেলাউস ছুটে গেলেন ডাইফোবাসের বাড়িতে। তিনি জানতেন সেখানেই হেলেন আছেন। গিয়ে দেখেন ডাইফোবাস মাটিতে, মৃত। ইউলিসিস জখম। হেলেন এগিয়ে এলেন ক্ষমা চেয়ে। হেলেনকে মারতেই শুধু বাকি ছিল। মেনেলাউস তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁরই জন্য তো এই ধ্বংসের পাট শুরু হয়েছিল। কিন্তু ইউলিসিস হেলেনকে বাঁচালেন। মেনেলাউসের কাছে হেলেনের প্রাণ ভিক্ষা করলেন। ইউলিসিসের কথা মেনেলাউস ফেলতে পারেননি। ট্রয় হয়ে গেল শুধু এক ধ্বংসের স্তূপ।

ইতিহাসেও প্রমাণ রয়েছে যে, ট্রয় শহর ধ্বংস হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা মাটি খুঁড়ে দেখিয়েছেন যে, কয়েক হাজার বছর আগে, ট্রয়ে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল। তাঁরা এও বলতে পারেন যে, হোমারের নায়কেরা যে-সব জায়গা থেকে এসেছিলেন, যেমন ইথাকার মত শহর বা মাইকেনিয়ার মত রাজ্য সবই ছিল। সুতরাং হোমার যে শুধু গল্প বলছিলেন এমন নয়। তাঁর রূপকথা ইতিহাসকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। যে যুগের ইতিহাস লোকে ভুলতে চলেছিল, হোমার এবং ও'র মত আরো অনেক গ্রীক চারণ-কবি সেই যুগটাকে মনে করিয়ে দেন। তোমাদের তো আগেই বলেছি, গ্রীসের লোকেরা তখন লিখতে জানতেন না। তার ফলে ট্রোজান যুদ্ধ নিয়ে কোনো কিছু লেখা ছিল না। হোমারের মতন কবিরা প্রথম লেখেন। কিন্তু এখানে একটা কথা আমাদের ভাবতেই হবে। হোমার বা তাঁর মতন অন্যরা তো কবি ছিলেন, ইতিহাসের ছাত্র নয়। আরেকটা কথাও ভাবতে হবে। যাঁরা ও'দের গল্পগাথা শুনতেন, তাঁরাও কেউ ইতিহাসের ছাত্র বা ছাত্রী ছিলেন না। হোমারের এ-সব কথা মনে রেখে লিখতে হয়েছিল। এমনভাবে লিখতে হয়েছিল, যাতে তাঁদের শ্রোতারা তাঁদের কথা বুঝতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে। সে-দিকেই তাঁদের বেশী নজর ছিল, ইতিহাসের তথ্যের দিকে নয়। সুতরাং ভুল থেকে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। তাঁদের কবিতায় মাইকেনিয়ান যুগের বহু প্রাসাদের চমৎকার সব বর্ণনা রয়েছে ; ওই যুগের প্রাসাদগুলি সত্যিই ওরকম দেখতে ছিল কিনা সেটা আমরা জানি না। কিংবা হোমার যখন যুদ্ধের রথ নিয়ে লিখছেন তখন ভুল হয়ে যাওয়া কিছু কঠিন নয়, কারণ হোমারের যুগে তো আর যুদ্ধে রথ ব্যবহার হত না। হোমার তাহলে কী করেই বা জানবেন এতদিন আগে ঠিক কীভাবে কী হয়েছিল? গল্পের অনেকাংশ নিশ্চয়ই কাল্পনিক। মানুষের প্রথম ঐতিহাসিক গ্রীক লেখক হেরোডোটাস্ মনে করতেন, ট্রোজান যুদ্ধের সময় হেলেন ট্রয় শহরে ছিলেনই না। তাতে কি কারও কিছু যায় আসে?

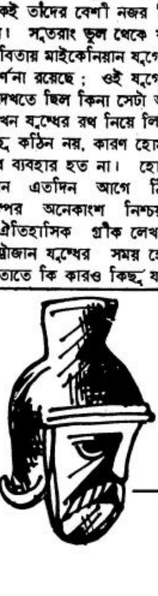

বিন্দু বিসর্গ

সেসময়ে প্রতি রবিবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সদলে শিকার করতে যেতেন। দলে থাকতেন মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্রজনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে। যেতেন সকালবেলা। ধাপার মাঠে। সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক থাকত আর থাকত প্রচুর খাবার।

শিকারকাহিনী ফলাও করে বলবার মত নয়। উদ্যোগ-আয়োজন যদিও নিখুঁত, তবু সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, খুব বেশী পশুপক্ষী হতাহত হয়নি।

ফিরতি পথে একদিন নজরে পড়ল, অচেনা-অজানা কার একটা বাগানে সুন্দর ডাব ফলে আছে। কে জানে বাগানের মালিকের কী নাম কী বৃত্তান্ত। সেটা জানা নেই বলেই বোধ করি সকলের ডাব খেতে ইচ্ছে হল।

ব্রজনাথবাবু সটান বাগানে ঢুকে পড়লেন। গম্ভীর মুখে মালীকে ডেকে বললেন, "ওরে মালী, মামা কই?"

এই বাগানে ঢুকে বাবু যখন মামার খোঁজখবর নিচ্ছেন, মালী ভাবল, এই বাবু নিশ্চয়ই মালিকের ভাগনে। মালিকের ভাগনের সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা কইতে হয়। মালী তাই ব্রজনাথকে বলল, "আজ্ঞে, তিনি তো আসেননি।"

মামা আসেননি, শুনে ভাগনেকে একটু চিন্তিত হতে হল। চিন্তাটিন্তা করে ভাগনেরূপী ব্রজনাথ বললেন, "তাই তো, মামা একেবারেই আসেননি?"

"আজ্ঞে না।"

"বটে? তবে আর কী হবে। আচ্ছা, তুই কটা ডাব পাড় দেখি।"

মালী তাড়াতাড়ি মালিকের ভাগনের হুকুম তামিল করল। ডাব পেড়ে নিয়ে এল। অচেনা-অজানা এক মামার বাগান প্রায় উজাড় করে দলের সকলে মহানন্দে ডাব খেয়ে নিলেন।

ইন্দ্রমিত্র

ঠিক সময়েই আমরা এসেছি, তাই না?
একেবারে ঠিক সময়ে! কিন্তু এলেন কেন?
আজ সকালে বেতার-বার্তায় জানলুম, এদিকে একদল হানাদার দেখা গেছে। বাস্, লোকজন সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম।
এবারে আমার লোকেরা ওদের বন্দী করে নিয়ে এলে তোমাদের যথাস্থানে পৌঁছে দেব।
মরুপথে কয়েক দিন চলার পর টিনটিন ও ক্যাপটেন মরক্কোর বাঘর বন্দরে এসে পৌঁছল...
প্রথমে জাহাজঘাটায় যাব। সেখানে কারাবুজানের খবর মিলতে পারে।
ঠিক কথা...
!
?
টিনটিন!...টিনটিন!... অত তাড়াতাড়ি ছুটো না...

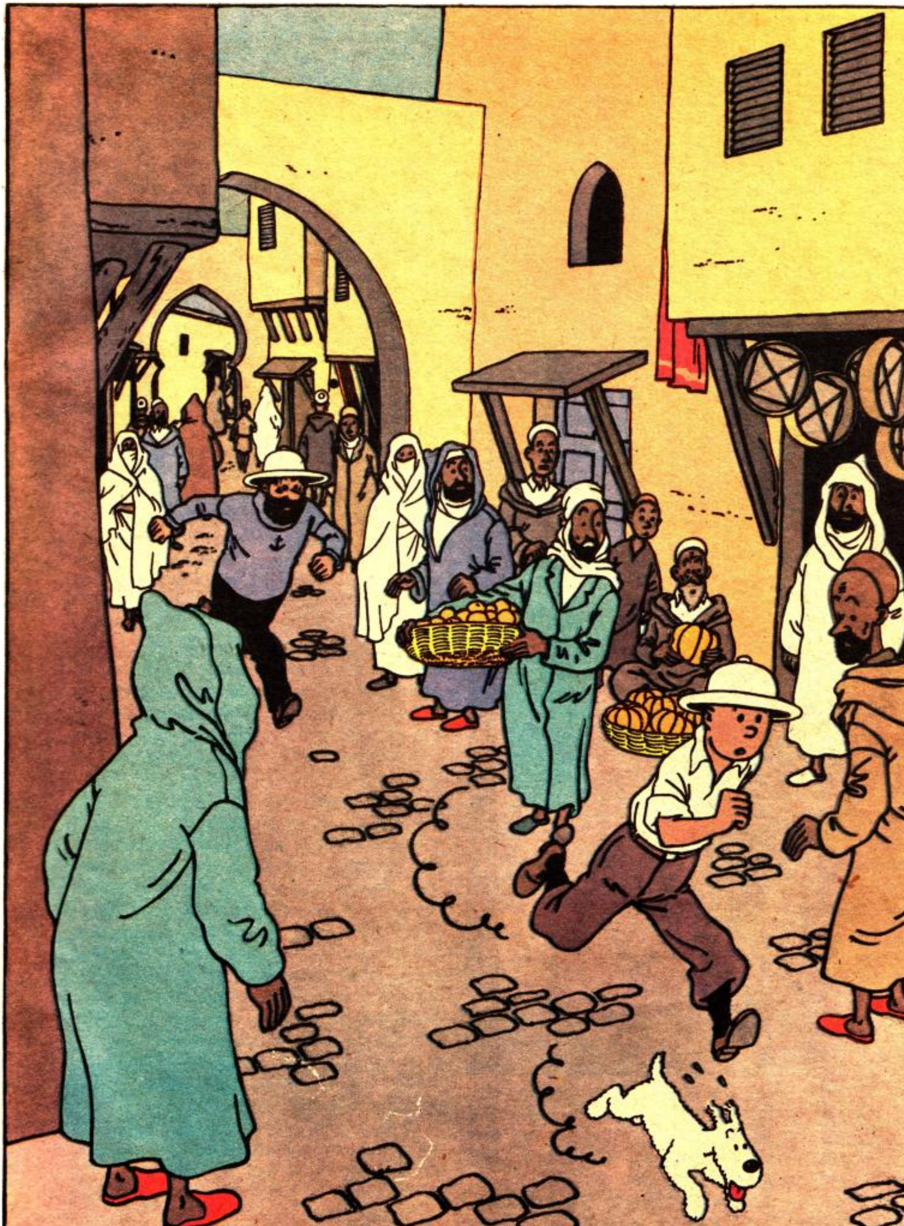

এর পর আগামী সংখ্যায়

জাদুঘর

বানররা সব মস্ত মস্ত পাথর আর মোটা মোটা গাছের গঁুড়ি বয়ে নিয়ে আসতে লাগল। চটপট সেতু তৈরী করতে হবে। বিরাট সেতু। সেই সেতু দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যাবেন রামচন্দ্র। সীতাকে উদ্ধার করবেন। বানরদের উৎসাহ দেখে কে!

ওরা যখন গোটা-গোটা পাহাড় তুলে নিয়ে আসছে, তখন দেখা গেল ছোট্ট একটি কাঠবিড়ালী মুখে করে নিয়ে আসছে নুড়ি। একজন বানর অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। "তুমি কী চাও?" জানতে চাইল সে।

"আজ্ঞে, আমি সেতু গড়ার কাজে সাহায্য করছি।" উত্তর দিল কাঠবিড়ালী, "দেখছ না আমি নুড়ি নিয়ে এসেছি।" তার কথা শুনে বানর হেসেই খুন। সে অন্য বানরদের ডেকে বলল, "শুনলে কাঠবিড়ালী কী বলছে? সে নাকি সেতু তৈরীর কাজে সাহায্য করছে।" "তাই নাকি?" অন্যরাও হেসে গড়াগড়ি যায়। একজন বলল, "দেখ বাপু, তুমি কি মনে কর তোমার ওই নুড়ি না-পেলে রামচন্দ্রের কিছুতেই সমুদ্র পার হওয়া হবে না?" বলেই আবার সে কী হাসি।

"বাঃ, আমি তা মনে করব কেন?" একেবারেই ঘাবড়ে না-গিয়ে উত্তর দিল কাঠবিড়ালী, "তোমাদের গায়ে বল আছে, তোমরা বড় বড় পাথর নিয়ে আসছ। আমার গায়ে জোর কম, আমি নুড়ি আনছি। যার যেমন ক্ষমতা।"

"ওসব রসিকতা রাখ।" ধমকে উঠল একজন, "কেটে পড় এখান থেকে, এটা রসিকতার সময় নয়। নয়তো এক সময় ছুঁড়ে দেব সমুদ্রে।"

কাঠবিড়ালী তবু ভয়ে পালিয়ে গেল না। সে তেমনই আপন মনে কুড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল নুড়ি। তার সাধ্যমত সে রামচন্দ্রকে সাহায্য করবেই। শেষ পর্যন্ত একজন বানর রেগে গিয়ে সত্যিই ছুঁড়ে দিল তাকে দূরে। ভয়ে চীৎকার করে উঠলো ছোট্ট কাঠ-বিড়ালী, "হে রাম, বাঁচাও!" ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে-ছিলেন রামচন্দ্র। পড়বি তো পড় গিয়ে ঠিক তাঁর কোলে। তিনি বানরদের ডেকে বললেন, "দেখ, ছোট বলেই কাউকে অবহেলা করা ঠিক নয়। এই কাঠবিড়ালী তার সাধ্যমত কাজ করেছে, সে আমার প্রিয়।" তিনি আদর করে হাত বুলোতে লাগলেন তার পিঠে। কিছুক্ষণ পরে কোল থেকে যখন নেমে এসেছে কাঠবিড়ালী, দেখা গেল তার বাদামী রঙের পিঠে সাদা সাদা ডোরা। ওরা বুঝলো, ভালবাসার চিহ্ন সেগুলো, রামের আঙুলের ছাপ। সেই থেকেই নাকি সব কাঠবিড়ালীর গায়ে সাদা ডোরা।

এই কাঠবিড়ালী অবশ্য ঠিক রামচন্দ্রের সেই কাঠ-বিড়ালীটি নয়; কারণ এর ঠিকানা সেতুবন্ধ বা কাছা-কাছি কোনও জায়গায় নয়, একে খুঁজে পাওয়া গিয়ে-ছিল মধ্যভারতের বরহুত বলে একটা জায়গায়। দু' হাজার বছরেরও আগে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছিল মস্ত একটি স্তূপ। গড়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের শিষ্যরা। সাঁচিতে যেমন। তার চারপাশে ছিল কারুকার্য-করা পাথরের বাহারী রেলিং। সুন্দর তোরণ। তারই গায়ে পাথরের ওপর খোদাই করা ছিল এই সুন্দর কাঠ-বিড়ালী। চঞ্চল। অতিশয় হুঁশিয়ার। ভীষণ দুষ্টু। দেখলে মনেই হয় না পাথরের। মনে হয় বাড়ির আশ-পাশেই কোনও গাছের ডালে লাফাচ্ছে সে। বোঝা যায়, যে শিল্পী এটি খোদাই করেছিলেন, রামচন্দ্রের মতোই কাঠবিড়ালীকে ভালবাসতেন তিনি। কিংবা ছোটদের মতোই তিনিও ছিলেন কাঠবিড়ালী-পাগল।

মনের মতো এই কাঠবিড়ালীকে যদি নিজের চোখে দেখতে চাও, তবে এই শীতেই কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে একবার উঁকি দিয়ে যাও।

শ্রীপান্থ

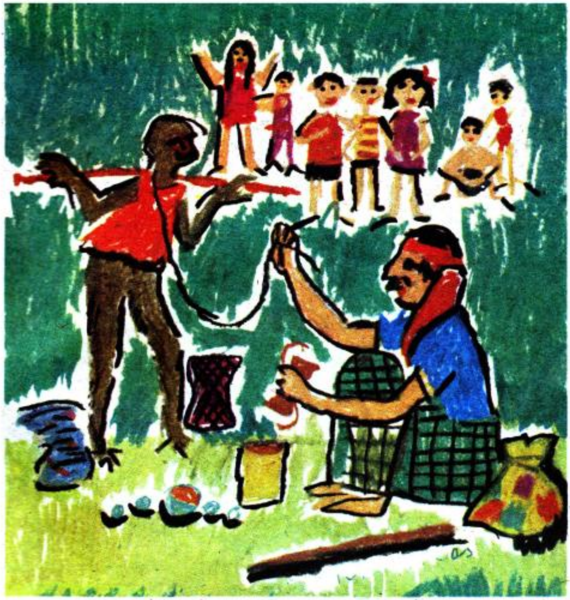

শিল্পী : মনেমনে দাশ (বয়স ৯)

তোমাদের পাতা

রিয়াজ

রিয়াজ আট-দশ বছরের একটি ছেলে। হয়ত অতও হবে না। ইস্কুলে যাবার পথে তাকে রোজই দেখি। ওর পা-গুলি সাধারণ মানুষের মত নয়। যার জন্য ওকে "খোঁড়া" "খোঁড়া" বলে ডাকে সবাই। আমি ছোটবেলায় দেখেছি ওকে হাতে-পায়ে চলতে। এখন ও দুই পায়ে ভর করে হেঁটে চলে। কিন্তু সাধারণ ছেলেদের মত নয়।

ওর গায়ের রং মিশমিশে কালো। চোখ দুটি বড় বড়। দাঁতগুলিও বড় বড়, বেরিয়ে থাকে। কথা ভাল বলতে পারে না। সব কথা বোঝাও যায় না।

কিন্তু ওর পড়বার ঝোঁক দারুণ। আমার দাদা চাকুরি না পাওয়ায় টিউশানি করেন। এবং রিয়াজদের পাড়ায় এক বৈঠকখানায় পড়াতে বসেন। দাদার কাছে শুনেছি, দাদা পড়াতে বসবেন আর রিয়াজও এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসবে। বসে বসে পড়া শুনবে। দাদা ওকে পড়াতে পারেন না। কী করে পড়াবেন? দাদা যাঁদের ছেলেদের পড়ান তাঁরা ওকে পড়তে দিতে নারাজ। তাঁরা বলেন, "গোলমাল করবে, আমাদের ছেলেদের পড়া-শোনা হবে না।" একদিন ওকে বাড়ির কর্তা তাড়াও করেছিলেন। সুতরাং দাদা পড়াতে পারেন না।

রিয়াজ ওর মাকে বলে, "মা, আমি ওদের বৈঠকখানায় পড়তে যাব।" মা কিছু বলতে পারে না, চুপ করে থাকে। দাদাই বলছিলেন, "রিয়াজ আজকাল বইয়ের ঝোলা কাঁধে নিয়ে চাদর জড়িয়ে আলো নিয়ে আলীদের বাড়ি পড়তে যায়। আধ ঘণ্টা মত পড়ে বাড়ি চলে যায় আলো নিয়ে।

ওর বাবা ওকে বেলপুকুরের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। রোজ ও ইস্কুলে যায়। মাঠের আল ধরে ওকে যেতে হয়। আলে আবার মাঝে মাঝে কাটা থাকে জল যাবার জন্য। ও পার হতে পারে না। হাতে-পায়ে পার হয় তখন।

সেদিন ও বাবার সাথে হাটে গিয়েছিল। শীতের চাদর-জামা কিনতে। যেটা আছে সেটা ছিঁড়ে গেছে। আমি ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম। দেখলাম তার গায়ে একটা নতুন চাদর। খুব রং-চঙে চাদর। ওর না জানি সেদিন কতই আনন্দ হয়েছিল। পরদিন দেখলাম একটা মোটা শীত-জামা পরে ইস্কুলে যাচ্ছে। খুব খুশী ও। নতুন চাদর, নতুন জামা। এবার থেকে আরো নতুন উদ্যমে ও পড়াশোনা করবে।

ভগবান যেন ওর বাসনা পূর্ণ করেন।

নাসিরুদ্দিন সরকার
(বয়স ১২)

তোমাদের পাতা

যখন আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাদের কিছুতেই পশ্চিম বাংলার ষোলোটা জেলার নাম মনে থাকতো না। সেই জন্য আমাদের মাস্টার মশাই জেলাগুলির নাম মনে রাখার জন্য একটি ছড়া শিখিয়েছিলেন। এই ছড়াটা হচ্ছে "মেজ মামু কহা বাপু, কুহু দাবী ২৪ দিন বর্ধমান" অর্থাৎ "মেজ"র "মে"তে মেদিনীপুর "জ"তে জলপাইগুড়ি "মামু"র "মা"তে মালদহ "মু"তে মুর্শিদাবাদ, "কহা"র 'ক'তে কলিকাতা 'হা'তে হাওড়া 'বাপু'র 'বা'তে বাকুড়া 'পু'তে পুরুলিয়া 'কুহু'র 'কু'তে কুচবিহার "হু"তে হুগলী "দাবী"র "দা'তে দার্জিলিং "বী"তে বীরভূম "২৪"এ ২৪ পরগণা 'দিন'এর 'দি'তে দিনাজপুর এবং "ন"তে নদীয়া এবং সবশেষে "বর্ধমান' বর্ধমানই থাকবে। এইবার দেখ ঠিক ষোলোটা জেলারই নাম বেড়িয়ে গেছে। যদি তোমাদের পশ্চিম বাংলার এই ষোলোটা জেলার নাম না মনে থাকে তবে এই ছড়াটা মনে রাখবে।

প্রদীপ দাস, দেবযানী দাস
(বয়স—১৪, ১৩)

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দু'টি ক্লাব,
তাদের নামেতে কোলকাতা হয় উন্মাদ।
যদি মোহনবাগান জিতে যায়,
চিংড়ির গন্ধে বাড়ি ভরে যায়।
যদি ইস্টবেঙ্গল জেতে,
সবাই আনন্দে উঠে মেতে।
পতাকা ওড়ানো, পটকা ফাটানো,
ইলিশ মাছকে মাঠ ঘোরানো,
তারপর বাড়ি গিয়ে ,
মাছটিকে ছুঁড়ে দিয়ে,
বসে পড়ে চেয়ারের কোলে,
ততক্ষণে মাছ ফোটে ঝোলে।

প্রদোষপ্রসাদ চক্রবর্তী
(বয়স—৯)

তোমাদের চিঠি

আনন্দমেলার সব কিছুই আমার প্রিয়। কার্তিক সংখ্যায় আনন্দিতা দত্ত নাম ওলটানো খেলায় আরও নাম জানতে চেয়েছেন। আমি চেষ্টা করে অনেকগুলি তৈরী করেছি।

১। সুবর্ণ বসু।
২। হাসানাহেনা সাহা।
৩। ইলু দলুই।
৪। লবণী বল।
৫। হংসিনী সিংহ।
৬। হারান রাহা।
৭। নীলিমা মালিনী।
৮। শ্রমিতা মিত্র।
৯। তারা তা।
১০। দাশু দাঁ।
১১। খাঁদু খাঁ।
১২। সুবাস বাসু।
১৩। গবাক্ষ বাগ।

শ্রীদুর্গাদাস বসু, (বয়স—৮)

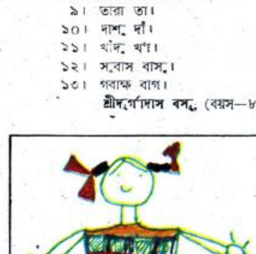

শিল্পী : নিয়ান (তন্বীষ্ঠা) ঘোষ (বয়স ৫)

বহুরূপী

আজব চিড়িয়াখানা

বাজপাখি ছোঁ মেরে পায়রা ধরে নিয়ে যায়, ঝুপ করে নেমে এসে ঈগল হঠাৎ পুকুর থেকে তুলে নেয় পাতি-হাঁস। এধরনের ডাকাতি হামেশাই ঘটে। অবশ্য গাঁয়ের দিকে। শহরের চিল ছোঁ মেরে খাবারের ঠোঙাটি কেড়ে নিতে পারলেই খুশী। সে দৃশ্য তোমরা দেখেছ হয়তো। কিন্তু একটা পাখি আস্ত একটা শুয়োর নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে,—ভাবাই যায় না!

শুয়োর তো ওর কাছে কিছুই না, গ্রিফন ইচ্ছে করলে সওয়ার সমেত ঘোড়া, কিংবা মাঠ থেকে জোড়া-বলদ তুলে নিয়ে যেতে পারতো। অনেকটা সেই 'টুনটুনির বই'য়ের 'পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর' গল্পের চিলের মতো কাণ্ড-কারখানা তার। ওই চিল মেছুনীর মাথা থেকে ছোঁ মেরে যে ঝুড়িটি তুলে নিয়েছিল তাতে নাকি দু'জন মানুষ কুস্তি লড়ছিল। গ্রিফনেরও ঝোঁক ছিল মানুষের ওপর। কারণ গোটা-গোটা মানুষ খেতে না-পারলে ওদের বাচ্চা-দের নাকি পেট ভরতো না! বোঝ তাহলে কেমন রাক্ষুসে পাখি।

রাক্ষুসে পাখির কথা অবশ্য আরও শোনা যায়। সিন্ধবাদের গল্পে আছে —রকপাখি। একশো' আটচল্লিশটি মুরগী-ডিমের মতো তার এক-একটা ডিমের সাইজ। সিন্ধবাদ বুদ্ধি করে তার পায়ের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে এক মুলুক থেকে উড়ে গিয়েছিল আর-এক মুলুকে। রক পাখি তবু পাখিই। গ্রিফনকে কিন্তু ষোল আনা পাখি বলা যায় না। সামনের দিকটা তার ঈগলের মতো হলেও পেছনের দিকটা অবিকল সিংহের মতো। এমন-কী সিংহের মতো লেজও আছে তার। আসলে পশুদের রাজা সিংহ আর পাখিদের রাজা ঈগল মিলিয়ে এই গ্রিফন। তবে একটা সিংহ আর একটা ঈগল নয়, এক একটা গ্রিফন আটটা সিংহ আর একশ' বড় বড় ঈগলের সমান। সুতরাং, শুয়োর কেন, ছোঁ মেরে হাতি নিয়ে পালিয়ে গেলেই বা তাকে ঠেকায় কে?

এক-এক দেশে এক-এক নাম তার। কেউ কেউ বলেন—গ্রিফিন। যে-নামেই ডাকি, এ-পাখির কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু যিশুর অন্তত তিন হাজার বছর আগে থেকে। নানা দেশের রাজবাড়িতে তার খুবই খাতির। রাজাদের পতাকায়, সিংহাসনে গ্রিফনের ছবি। কারণ গ্রিফন শক্তির প্রতীক। তা ছাড়া পাহারাদারের কাজেও জুড়ি নেই তার। গ্রিফন তার বাসার চারপাশে সাজিয়ে রাখত নাকি তাল তাল সোনা। কিন্তু কারও সাধ্য ছিল না তা চুরি করে।

কোথায় গেল সেই আজব পাখি? কোথায়ই বা তার মজুত সোনা? কেউ জানে না। তবে এটা সবাই জানেন, গ্রিফন মনের-পাখি হলেও এক সময়ে মস্ত-মস্ত পাখি সত্যিই ছিল এই দুনিয়ায়।

ধাঁধার পাতা

ছোট্‌কার মাথায় যে কত খেয়ালই চাপে! সেদিন ছোট্‌কার ঘরে গিয়ে দেখি, আলো-পড়া দেয়ালের গায়ে আঙুলের ছায়া ফেলে-ফেলে কী-সব কাণ্ড-কারখানা করে যাচ্ছে আপনমনে। কখনো চারটে আঙুলই মুঠো করা, শুধু বুড়ো আঙুল খোলা। কখনো পাঁচটা আঙুলই মুড়ে ফেলেছে। দেয়ালেও পড়ছে বিচিত্র সব ছায়া। হঠাৎ দেখলাম, আরে, স্পষ্ট একটা হরিণের মাথা। দু-পাশে দুটো শিং মুখটা নোয়ানো। ছোট্‌কার আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখি, অনামিকা আর মধ্যমা বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে, তর্জনী আর কনিষ্ঠা এমনভাবে সোজা করে রেখেছে যে, দেয়ালে তার ছায়া অবিকল একটা হরিণের মাথা বলে মনে হচ্ছে। বেশ মজার খেলা তো! ছোট্‌কার দেখাদেখি আমিও আঙুল মোড়া শিখতে চেষ্টা করি।

হঠাৎ ছোট্‌কা আমার দিকে ফিরে বললো, "সতুবাবু, এই আঙুলটা নাড়াও তো?" ছোট্‌কার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান হাতের সব কটি আঙুল মুড়ে রাখা, শুধু তর্জনীটা নাড়ছে ছোট্‌কা।

এ আর এমন শক্ত কী। ছোটকার মতো আমিও নিজের ডান হাতের তর্জনীটা নাড়াতে লাগলাম।

"উঁহু। হলো না। এই আঙুলটা নাড়াতে বলছি তোমায়।" ডান হাতখানা আমার মুখের আরো কাছে নিয়ে আসে ছোট্‌কা।

আমি ভালো করে দেখি। না, কোনো ভুল হচ্ছে না। আবার নিজের তর্জনীটা নাড়াই।

"এবারেও হলো না। তুমি হেরে গেলে। তুমি আমাকে একবার ওই ভাবে বলো তো সতুবাবু। তবেই বুঝতে পারবে।" ছোট্‌কা কেমন হাসিহাসি মুখে বলে।

আমার তর্জনী তোলাই ছিল। কী হয় দেখবার কৌতূহল নিয়ে আমি বললাম, "এই আঙুলটা নাড়াও দেখি।"

তক্ষুনি ছোট্‌কা কাছে এসে আমার তর্জনীটা ধরে দু-বার নাড়িয়ে দিলো। দিয়ে, হো-হো করে হেসে বললো, "আমি কি তোমাকে বলেছি, তোমার আঙুল নাড়াতে? আমি আমার আঙুল নাড়াতে বললাম, আর তুমি কিনা তখন থেকে নিজের আঙুল নাড়িয়ে যাচ্ছ।"

তাই তো। খুব ঠকে গেছি যা হোক। চটপট কিছু নতুন ধাঁধা পেয়ে গেলাম ছোট্‌কার কাছে।

প্রথম ধাঁধা:

পুরাণের নামী রাজা, গ্রহ-বৈগুণ্যে
স্বর্গে না মর্ত্যে না, থেকে যান শূন্যে।
সংখ্যাবাচক শির বিলোপে সযত্ন
নবরত্নের এক পুরাতন রত্ন।

দ্বিতীয় ধাঁধা: পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে এমন একশোটা ইংরেজী শব্দ বলতে পারো যার মধ্যে 'a' নেই?

তৃতীয় ধাঁধা: মেসে একই ঘরে থাকেন রামবাবু, শ্যামবাবু আর মধুবাবু। তিনজন তিন বয়সী। রামবাবু বিয়ে থা করেননি। তিনজনের মধ্যে বয়সে যিনি ছোট—তাঁর রোজগারের থেকেও কম আয় করেন শ্যামবাবু। প্রবীণতম ব্যক্তিটিরই আয় সব থেকে বেশী, খরচও সব থেকে বেশী; ছেলেটি হোসটেলে থেকে পড়ে, তার জন্যই মাসে বিস্তর যায়।

বলো তো, তিনজনের মধ্যে সব থেকে বেশী বয়স কার? কনিষ্ঠই বা কোন্‌ জন?

চতুর্থ ধাঁধা: একটি বাক্সে ১০ জোড়া সাদা ও ১০ জোড়া কালো মোজা রয়েছে, আরেকটি বাক্সে রয়েছে সম-সংখ্যক সাদা ও কালো দস্তানা। একই রঙের এক জোড়া মোজা ও এক জোড়া দস্তানা পেতে হলে কম পক্ষে কটি মোজা ও কটি দস্তানা তুলতে হবে? মনে রেখো, তুলতে হবে কিন্তু না-দেখে।

গতবারের ধাঁধার উত্তর: (১) গোলমালটা হচ্ছে মালীর বকশিসের ২ টাকাকে দু-বার হিসেবের মধ্যে ধরায়। বাড়ি ভাড়া ২৫+বকশিস ২+ফেরত ৩ টাকা=৩০ টাকা, এইটেই সঠিক হিসেব। মাথা পিছু ৯ টাকা করে তিনজনের ২৭ টাকা খরচ হলে তার মধ্যেই তো বকশিসের ২ টাকা ধরা হচ্ছে, সুতরাং আবার ২ টাকা যোগ হবে কী করে? (২) 'তা' শব্দটি (৩) আর মাত্র একদিন লাগবে (৪) ৮,১২, ৫,২০

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো

প্রঃ কোন লোকটাকে চেয়ার ছাড়া দেখা যায় না?

উঃ চেয়ারম্যানকে।

প্রঃ হাতিদের গায়ের চামড়া এত কুঁচকোনো কেন?

উঃ কখনো ইস্ত্রি করার চেষ্টা করে দেখেছ?

প্রঃ ঘুম থেকে উঠে দেখছি জামাটা ছোট হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কী?

উঃ লম্বা ঘুম দিয়েছিলে নিশ্চয়!

প্রঃ আমার চোদ্দটা গরুর বদলে তোমার কাছ থেকে সতেরোটা ছাগল নিলাম, আর তোমার কাছ থেকে আরো সাতটা গরু পেলাম। তাহলে হরে-দরে কী পাচ্ছি?

উঃ অনেক দুধ।

প্রঃ সব সময়েই পড়ছে তবু ব্যথা লাগেনা কার?

উঃ বৃষ্টির।

প্রঃ মনে করো ক্লাসে আমি কয়েকটা কুকুর আনলাম—তিনটে ছাড়া আছে, তিনটে বাঁধা, কটা হল?

উঃ দারোয়ান স্কুলে কুকুর আনতেই দেবেনা।

প্রঃ গাছের কোন্‌ অংশটা খাবার সময় রোজই দরকার?

উঃ ডাল।

প্রঃ হস্তদন্ত মোটা ভদ্রলোক-টিকে পুলিশ যখন বলল, ওয়েট ওয়েট তখন উনি কী বললেন?

উঃ নব্বই কেজি।

REGD. NO. WB/CC 264
ANANDAMELA
দেড় টাকা

আনন্দমেলা